

পাঠ্যবইয়ের গদ্য ও কবিতার সারসংক্ষেপ

সারসংক্ষেপ

১. যশের জন্য লিখিবেন না। তাহা হইলে যশও হইবে না, লেখাও ভালো হইবে না। লেখা ভালো হইলে যশ আপনি আসিবে। টাকার জন্য লিখিবেন না। অর্থের উদ্দেশ্যে লিখিতে গেলে লোকরঞ্জন-প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া পড়ে এবং সাধারণ পাঠকের রুচি ও শিক্ষা বিবেচনা করিয়া লোকরঞ্জন করিতে গেলে রচনা বিকৃত ও অনিষ্টকর হইয়া উঠিতে পারে। যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন। যাহা অসত্য, ধর্মবিরুদ্ধ; পরনিন্দা বা পরপীড়ন বা স্বার্থসাধন যাহার উদ্দেশ্য, সে সকল প্রবন্ধ কখনও হিতকর হইতে পারে না, সুতরাং তাহা একেবারে পরিহার্য। সত্য ও ধর্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। যাহা লিখিবেন, তাহা হঠাৎ ছাপাইবেন না; কিছু কাল ফেলিয়া রাখিবেন এবং পরে সংশোধন করিবেন। যে বিষয়ে যাহার অধিকার নাই, সে বিষয়ে তাহার হস্তক্ষেপ অকর্তব্য। বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা করিবেন না; বিদ্যা থাকিলে তাহা আপনিই প্রকাশ পায়। অলংকার-প্রয়োগ বা রসিকতার জন্যও চেষ্টিত হইবেন না। সকল অলংকারের শ্রেষ্ঠ অলংকার সরলতা। যিনি সোজা কথায় মনের ভাব সহজে পাঠককে বুঝাইতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক। কাহারও অনুকরণ করিও না; অনুকরণে দোষগুলি অনুকৃত হয়, গুণগুলি হয় না। যে কথার প্রমাণ দিতে পারিবে না, তাহা লিখিও না। এই নিয়মগুলি বাঙ্গালার লেখকদিগের দ্বারা রক্ষিত হইলে, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি বেগে হইতে থাকিবে।

সারসংক্ষেপ

সাহিত্যচর্চার উদ্দেশ্য যশ বা অর্থলাভ নয়; লেখকের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত দেশ ও মানুষের কল্যাণ এবং সৌন্দর্য সৃষ্টি। তাই অসত্য, পরনিন্দা, পরপীড়ন ও স্বার্থসাধনমূলক রচনা পরিহার করে সত্য ও কল্যাণের পক্ষে লেখনী পরিচালনা করতে হবে। রচনা প্রকাশের আগে তা সময় নিয়ে সংশোধন করা এবং নিজের জ্ঞানের সীমা সম্পর্কে সচেতন থাকা প্রয়োজন। লেখায় বিদ্যা জাহির, কৃত্রিম অলংকার ও অন্যের অনুকরণ পরিহার করে সরল ও স্বাভাবিক ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করতে হবে। প্রমাণহীন বক্তব্য থেকেও বিরত থাকতে হবে। লেখকের এই সততা, সংযম ও সরলতাই বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে সহায়ক হতে পারে।

– বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন

২. সাহিত্যিকের লেখার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত দেশের ও মানুষের কল্যাণ সাধন এবং সৌন্দর্য সৃষ্টি। শুধু যশ বা অর্থলাভের আকাঙ্ক্ষায় লেখনী ধারণ করা উচিত নয়। অর্থের জন্য লিখতে গেলে অনেক সময় পাঠকের রুচি অনুযায়ী লেখাকে কৃত্রিম ও অনিষ্টকর করে তোলার প্রবণতা দেখা দেয়। অসত্য, ধর্মবিরুদ্ধ, পরনিন্দা, পরপীড়ন ও স্বার্থসাধনমূলক রচনা কখনো মানুষের প্রকৃত কল্যাণ করতে পারে না। তাই লেখকের উচিত সত্য ও ন্যায়ের প্রতি নিষ্ঠাবান থাকা। কোনো লেখা প্রকাশের আগে কিছুদিন রেখে দিয়ে তা পুনরায় পড়ে সংশোধন করা প্রয়োজন। যে বিষয়ে লেখকের যথেষ্ট জ্ঞান বা অধিকার নেই, সে বিষয়ে লেখনী পরিচালনা করা উচিত নয়। বিদ্যা জাহির করার চেষ্টা না করে সহজ ও সরল ভাষায় নিজের বক্তব্য প্রকাশ করতে হবে। অন্যের অনুকরণ না করে নিজের স্বতন্ত্র চিন্তা

ও প্রকাশভঙ্গি গড়ে তোলা প্রয়োজন। প্রমাণহীন কোনো কথা লেখায় স্থান দেওয়া উচিত নয়। লেখকের সততা, সংযম ও দায়িত্বশীলতার ওপরই সাহিত্যের প্রকৃত উৎকর্ষ নির্ভর করে।

– বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন

সারসংক্ষেপ

সাহিত্যের উদ্দেশ্য যশ বা অর্থলাভ নয়; মানুষের কল্যাণ ও সৌন্দর্য সৃষ্টি করাই লেখকের প্রধান দায়িত্ব। তাই সত্য, ন্যায় ও মানবকল্যাণের বিরোধী বিষয় থেকে লেখককে দূরে থাকতে হবে। রচনা প্রকাশের আগে তা সংশোধন করা, নিজের জ্ঞানের সীমা মেনে চলা এবং প্রমাণহীন বক্তব্য পরিহার করা প্রয়োজন। বিদ্যা জাহির বা অন্যের অনুকরণ না করে সরল ও স্বতন্ত্র ভাষায় ভাব প্রকাশ করাই উৎকৃষ্ট লেখকের পরিচয়। লেখকের সততা, দায়িত্ববোধ ও সংযত প্রকাশভঙ্গিই সাহিত্যকে সুন্দর, গ্রহণযোগ্য ও কল্যাণমুখী করে তোলে।

– বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন

৩. মূল অংশ

অলংকার-প্রয়োগ বা রসিকতার জন্য লেখককে বিশেষ চেষ্টা করতে হবে না। লেখকের মধ্যে যথেষ্ট সৃজনশীলতা থাকলে প্রয়োজনের সময় অলংকার ও রসিকতা স্বাভাবিকভাবেই লেখায় প্রকাশ পাবে। অপ্রয়োজনীয় অলংকার বা কৃত্রিম রসিকতা রচনার সৌন্দর্য নষ্ট করে। কোনো অংশ খুব সুন্দর মনে হলে তা নিয়ে বন্ধুদের সামনে বারবার পড়ে শোনা যেতে পারে; এতে লেখক নিজেই তার দুর্বলতা বুঝতে পারবেন এবং প্রয়োজন হলে অংশটি বাদ দিতে পারবেন। সকল অলংকারের শ্রেষ্ঠ অলংকার হলো সরলতা। যিনি সহজ ও সোজা কথায় নিজের মনের ভাব পাঠকের কাছে স্পষ্টভাবে পৌঁছে দিতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক। লেখার উদ্দেশ্য হলো পাঠককে বিষয়টি সহজে বোঝানো। তাই কৃত্রিমতা নয়, স্বাভাবিকতা ও স্পষ্টতাই লেখার প্রধান গুণ। অন্য কোনো লেখকের অনুকরণ করাও উচিত নয়, কারণ অনুকরণ করতে গিয়ে সাধারণত লেখকের দোষগুলো অনুসৃত হয়, গুণগুলো অর্জিত হয় না। নিজের স্বতন্ত্র চিন্তা ও প্রকাশভঙ্গির মাধ্যমে সাহিত্যচর্চা করাই লেখকের জন্য শ্রেয়।

– বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন

সারসংক্ষেপ

লেখায় কৃত্রিম অলংকার ও রসিকতার চেষ্টা না করে স্বাভাবিক ও সরল প্রকাশভঙ্গিকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কোনো রচনার অংশ নিজের কাছে আকর্ষণীয় মনে হলেও তা অন্যের কাছে পড়ে শুনিয়ে প্রয়োজন হলে সংশোধন বা বর্জন করা দরকার। সহজ ভাষায় মনের ভাব পাঠকের কাছে স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়াই উৎকৃষ্ট লেখার প্রধান বৈশিষ্ট্য। অন্যের অনুকরণে প্রকৃত সাহিত্যিক গুণ অর্জিত হয় না; বরং নিজের স্বতন্ত্র চিন্তা ও প্রকাশভঙ্গিই একজন লেখককে সার্থক করে তোলে।

– বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন

ঠিক আছে। এখন থেকে প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রথমে ‘মূলপাঠ’ অংশে গল্প/কবিতা/প্রবন্ধ থেকে নির্বাচিত মূল অংশটি যথাসম্ভব ছব্ব রাখব। এরপর তার নিচে ‘সারসংক্ষেপ’ লিখব। সারসংক্ষেপ হবে ওই মূলপাঠের বক্তব্য থেকেই সংক্ষিপ্ত, সুন্দর ও পরীক্ষোপযোগী রূপে—বাইরের কোনো তথ্য বা নিজের বানানো ব্যাখ্যা যোগ করব না।

৩. মূলপাঠ

পণ সম্বন্ধে দুই পক্ষে পাকাপাকি কথা ঠিক হইয়া গিয়াছিল। মামা নিজেকে অসামান্য চতুর বলিয়াই অভিমান করিয়া থাকেন। কথাবার্তায় কোথাও তিনি কিছু ফাঁক রাখেন নাই। টাকার অঙ্ক তো স্থির ছিলই, তারপরে গহনা কত ভরির

এবং সোনা কত দরের হইবে সেও একেবারে বাঁধাবাঁধি হইয়া গিয়াছিল। আমি নিজে এসমস্ত কথার মধ্যে ছিলাম না; জানিতাম না দেনা-পাওনা কী স্থির হইল। মনে জানিতাম, এই ঝুল অংশটাও বিবাহের একটা প্রধান অংশ, এবং সে অংশের ভার যার উপরে তিনি এক কড়াও ঠকিবেন না। বস্তুত, আশ্চর্য পাকা লোক বলিয়া মামা আমাদের সমস্ত সংসারের প্রধান গর্বের সামগ্রী। যেখানে আমাদের কোনো সম্বন্ধ আছে সেখানে সর্বত্রই তিনি বুদ্ধির লড়াইয়ে জিতিবেন, এ একেবারে ধরা কথা, এই জন্য আমাদের অভাব না থাকিলেও এবং অন্য পক্ষের অভাব কঠিন হইলেও জিতিব, আমাদের সংসারের এই জেদ-ইহাতে যে বাঁচুক আর যে মরুক।

গায়ে-হলুদ অসম্ভব রকম ধুম করিয়া গেল। বাহক এত গেল যে তাহার আদম গুমারি করিতে হইলে কেরানি রাখিতে হয়। তাহাদিগকে বিদায় করিতে অপর পক্ষকে যে নাকাল হইতে হইবে, সেই কথা স্মরণ করিয়া মামার সঙ্গে মা একযোগে বিস্তর হাসিলেন।

ব্যাভ, বাঁশি, শখের কন্সট প্রভৃতি যেখানে যতপ্রকার উচ্চ শব্দ আছে সমস্ত একসঙ্গে মিশাইয়া বর্বর কোলাহলের মত হস্তী দ্বারা সংগীত সরস্বতীর পদবন দলিত বিদলিত করিয়া আমি তো বিবাহ-বাড়িতে গিয়া উঠিলাম। আংটিতে হারেতে জরি-জহরতে আমার শরীর যেন গহনার দোকান নিলামে চড়িয়াছে বলিয়া বোধ হইল। তাঁহাদের ভাবী জামাইয়ের মূল্য কত সেটা যেন কতক পরিমাণে সর্বাস্থে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া ভাবী শ্বশুরের সঙ্গে মোকাবিলা করিতে চলিয়াছিলাম।

মামা বিবাহ-বাড়িতে ঢুকিয়া খুশি হইলেন না। একে তো উঠানটাতে বরযাত্রীদের জায়গা সংকুলান হওয়াই শক্ত, তাহার পরে সমস্ত আয়োজন নিতান্ত মধ্যম রকমের। ইহার পরে শঙ্কুনাথবাবুর ব্যবহারটাও নেহাত ঠাণ্ডা। তাঁর বিনয়টা অজস্র নয়।

সারসংক্ষেপ

পণ সম্বন্ধে দুই পক্ষে পাকাপাকি কথা ঠিক হইয়াছিল এবং টাকার অঙ্ক, গহনার পরিমাণ ও সোনার দরও নির্দিষ্ট ছিল। মামা বিবাহের দেনা-পাওনার ব্যাপারে কোনো ফাঁক রাখিতে চান নাই। গায়ে-হলুদের অনুষ্ঠান ধুমধাম করিয়া হইল এবং বরযাত্রীদের বিদায়ের কথা মনে করিয়া মামা ও মা হাসিলেন। ব্যাভ, বাঁশি ও নানা বাদ্যযন্ত্রের শব্দে বিবাহবাড়ি মুখর হইয়া উঠিল। গহনা ও পোশাকে অনুপমের শরীর যেন গহনার দোকানে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু বিবাহবাড়িতে গিয়া মামা খুশি হইলেন না; উঠানে জায়গার সংকট ও আয়োজনের স্বল্পতা তাঁহার পছন্দ হইল না।

— অপরিচিতা

৪. মূলপাঠ

তার পরে বুঝিলাম, মাতৃভূমি আছে। সেই বিবাহ-ভাঙার পর হইতে কল্যাণী মেয়েদের শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু আমি আশা ছাড়িতে পারিলাম না। সেই সুরটি যে আমার হৃদয়ের মধ্যে আজও বাজিতেছে—সে যেন কোন ওপারের বাঁশি—আমার সংসারের বাহির হইতে আসিল—সমস্ত সংসারের বাহিরে ডাক দিল। আর, সেই-যে রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে আমার কানে আসিয়াছিল “জায়গা আছে”, সে যে আমার চিরজীবনের গানের ধূয়া হইয়া রহিল। তখন আমার বয়স ছিল তেইশ, এখন হইয়াছে সাতাশ। এখনো আশা ছাড়ি নাই, কিন্তু মাতুলকে ছাড়িয়াছি। নিতান্ত এক ছেলে বলিয়া মা আমাকে ছাড়িতে পারেন নাই।

তোমরা মনে করিতেছ, আমি বিবাহের আশা করি? না, কোনো কালেই না। আমার মনে আছে, কেবল সেই এক রাত্রির অজানা কণ্ঠের মধুর সুরের আশা—জায়গা আছে। নিশ্চয়ই আছে। নইলে দাঁড়াব কোথায়। তাই বৎসরের পর বৎসর যায় আমি এইখানেই আছি। দেখা হয়, সেই কণ্ঠ গুনি, যখন সুবিধা পাই কিছু তার কাজ করিয়া দিই—আর

মন বলে, এই তো জায়গা পাইয়াছি। ওগো অপরিচিতা, তোমার পরিচয়ের শেষ হইল না, শেষ হইবে না; কিন্তু ভাগ্য আমার ভালো, এই তো আমি জায়গা পাইয়াছি।

সারসংক্ষেপ

বিবাহ ভাঙার পর কল্যাণী মেয়েদের শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। অনুপমের হৃদয়ে তাহার কণ্ঠের সুর আজও বাজিতেছে এবং রাত্রির সেই “জায়গা আছে” কথাটি তাহার চিরজীবনের গানের ধুয়া হইয়া রহিয়াছে। অনুপম বিবাহের আশা করে না; সে কেবল সেই অজানা কণ্ঠের মধুর সুরের আশা করে। বৎসরের পর বৎসর সে কল্যাণীর দেখা পায়, তাহার কণ্ঠ শোনে এবং সুযোগমতো তাহার কিছু কাজ করিয়া দেয়। তাহার মনে হয়, এইভাবেই সে কল্যাণীর হৃদয়ে জায়গা পাইয়াছে।

– অপরিচিতা

৫. সাহিত্যে খেলা – প্রমথ চৌধুরী

মূলপাঠের নির্বাচিত অংশ :

শিল্পীর সৃষ্টিকর্মের মধ্যে খেলাভাবের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে। পৃথিবীর শিল্পীরা তাঁদের সৃষ্টিশক্তির সাহায্যে নানা রূপ ও ভাব প্রকাশ করেন; তাঁদের হাতে শিল্পের নানা দিকে বিচরণের স্বাধীনতা থাকে। সাধারণ মানুষের মনও স্বাভাবিকভাবে নানা দিকে যেতে চায়, কিন্তু সমাজের প্রচলিত ধারণা মানুষকে সব সময় উচ্চ আদর্শ ও গুরুগম্ভীরতার দিকে থাকতে পরামর্শ দেয়। অথচ সাহিত্যে ছোট-বড় সবারই স্বাধীনভাবে সৃষ্টিশীল খেলায় অংশ নেওয়ার অধিকার রয়েছে। গান করলেই যে সব সময় উচ্চ সুরে ভাব প্রকাশ করতে হবে বা কবিতা লিখলেই যে কেবল গভীর ও প্রখর অনুভূতি প্রকাশ করতে হবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। সাহিত্যের জগতে খেলার আনন্দের অধিকার সকলের সমান। মানুষ সাধারণত খেলা দেখতে ভালোবাসে, কারণ খেলায় কোনো প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য থাকে না। খেলার সময় মানুষ কেবল আনন্দের জন্যই অংশ নেয়; অন্য কোনো লাভের প্রত্যাশা থাকে না। তাই সাহিত্যে সৃষ্টিশীল খেলা মানুষের স্বাভাবিক আনন্দ ও আত্মপ্রকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ পথ।

সারসংক্ষেপ

শিল্প ও সাহিত্যের সৃষ্টিতে মুক্ত ও আনন্দময় খেলার প্রবণতা স্বাভাবিক। মানুষের মন নানা দিকে বিচরণ করতে চায়, কিন্তু সমাজ তাকে সব সময় গুরুগম্ভীরতার সীমায় আবদ্ধ রাখতে চায়। সাহিত্যে এমন বাধ্যবাধকতা থাকা উচিত নয়। ছোট-বড় সব লেখকেরই স্বাধীনভাবে সাহিত্যসৃষ্টির অধিকার রয়েছে। সাহিত্য কেবল গভীর ভাব প্রকাশের মাধ্যম নয়; আনন্দের জন্যও সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে। খেলার মতো সাহিত্যসৃষ্টির মূল শক্তি হলো আনন্দ ও স্বাধীন আত্মপ্রকাশ। তাই সাহিত্যে সৃষ্টিশীল খেলার সুযোগ সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকা প্রয়োজন।

– সাহিত্যে খেলা

৬. সাহিত্যে খেলা – প্রমথ চৌধুরী

মূলপাঠের নির্বাচিত অংশ :

সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য মানুষের মনে আনন্দ সৃষ্টি করা; কেবল লোকের মনোরঞ্জন করা তার উদ্দেশ্য নয়। লেখক যখন পাঠকের সাময়িক রুচি ও চাহিদা পূরণের জন্য সাহিত্য রচনা করেন, তখন সাহিত্য তার স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়। পাঠকের পছন্দ অনুযায়ী তৈরি করা সাহিত্যিক খেলনা সাময়িকভাবে জনপ্রিয় হতে পারে, কিন্তু তার স্থায়ী মূল্য নাও থাকতে পারে। সাহিত্যের উদ্দেশ্য কাউকে শিক্ষা দেওয়াও নয়। শিক্ষা মানুষের মনকে বিশ্বের নানা বিষয় সম্পর্কে জানায়, আর সাহিত্য মানুষের মনকে জাগিয়ে তোলে। শিক্ষার বিষয় মানুষ অনেক সময় অনিচ্ছায় গ্রহণ

করে, কিন্তু সাহিত্য মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে গ্রহণ করে। কাব্যরসের আনন্দ মানুষের অন্তরকে স্পর্শ করে এবং সেই আনন্দ অন্যের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। তাই সাহিত্যকে কেবল শিক্ষার বাহন হিসেবে দেখলে তার প্রকৃত স্বরূপ বোঝা যায় না। সাহিত্য মানুষের অন্তরের পূর্ণতা ও সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ; তার প্রধান শক্তি আনন্দ।

সারসংক্ষেপ :

সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য মানুষের অন্তরে আনন্দ সৃষ্টি করা। পাঠকের সাময়িক মনোরঞ্জননের জন্য সাহিত্য রচনা করলে তার স্বাভাবিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। একইভাবে সাহিত্যকে কেবল শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসেবেও বিবেচনা করা যায় না। শিক্ষা মানুষকে জ্ঞান দেয়, আর সাহিত্য মানুষের অন্তরকে জাগিয়ে তোলে। মানুষ সাহিত্য থেকে আনন্দ স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করে এবং সেই আনন্দ অন্যের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। তাই সাহিত্য কোনো খেলনা বা শিক্ষার উপকরণ নয়; এটি মানুষের অন্তরের সৃষ্টিশীল আনন্দের প্রকাশ।

– সাহিত্যে খেলা

৭. মূলপাঠের সংক্ষিপ্ত অংশ

সাহিত্যে খেলা করবার অধিকার যে আমাদের আছে, শুধু তাই নয়, স্বার্থ এবং পরার্থ এ দুয়ের যুগপৎ সাধনের জন্য মনোজগতে খেলা করাই হচ্ছে আমাদের পক্ষে সর্বপ্রধান কর্তব্য। যে লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে ফলের চাষ করতে ব্রতী হন, যিনি কোনোরূপ কার্য-উদ্ধারের অভিপ্রায়ে লেখনী ধারণ করেন, তিনি গীতের মর্মও বোঝেন না, গীতার ধর্মও বোঝেন না। কেননা খেলা হচ্ছে জীবজগতে একমাত্র নিষ্কাম কর্ম, অতএব মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়।

স্বয়ং ভগবান বলেছেন, যদিচ তাঁর কোনোই অভাব নেই তবুও তিনি এই বিশ্ব সৃজন করেছেন, অর্থাৎ সৃষ্টি তাঁর লীলামাত্র। কবির সৃষ্টিও এই বিশ্বসৃষ্টির অনুরূপ, সে সৃজনের মূলে কোনো অভাব দূর করবার অভিপ্রায় নেই—সে সৃষ্টির মূল অন্তরাত্মার স্ফূর্তি এবং তার ফুল আনন্দ। এক কথায় সাহিত্যসৃষ্টি জীবাত্মার লীলামাত্র, এবং সে লীলা বিশ্বলীলার অন্তর্ভূত; কেননা জীবাত্মা পরমাত্মার অঙ্গ এবং অংশ।

সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেওয়া, কারো মনোরঞ্জন করা নয়। এ দুয়ের ভিতর যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ আছে, সেইটি ভুলে গেলেই লেখকেরা নিজে খেলা না করে পরের জন্যে খেলনা তৈরি করতে বসেন। সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলে সাহিত্য যে স্বধর্মচ্যুত হয়ে পড়ে, তার প্রমাণ বাংলাদেশে আজ দুর্লভ নয়। কাব্যের ঝুমঝুমি, বিজ্ঞানের চুম্বিকাঠি, দর্শনের বেলুন, রাজনীতির রাঙা লাঠি, ইতিহাসের ন্যাকড়ার পুতুল, নীতির টিনের ভেঁপু এবং ধর্মের জয়ঢাক—এই-সব জিনিসে সাহিত্যের বাজার ছেয়ে গেছে। সাহিত্যরাজ্যে খেলনা পেয়ে পাঠকের মনস্তৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু তা গড়ে লেখকের মনস্তৃষ্টি হতে পারে না।

সারসংক্ষেপ

সাহিত্যসৃষ্টির প্রধান ভিত্তি হলো নিষ্কাম আনন্দ ও সৃষ্টিশীল লীলা। লেখকের উদ্দেশ্য কোনো পার্থিব লাভ, সামাজিক উদ্দেশ্যসাধন কিংবা পাঠককে তুষ্ট করা হওয়া উচিত নয়। যেমন ঈশ্বরের বিশ্বসৃষ্টি তাঁর লীলামাত্র, তেমনি কবির সাহিত্যসৃষ্টিও অন্তরের স্ফূর্তি ও আনন্দের প্রকাশ। সাহিত্য মানুষের মধ্যে আনন্দ জাগাবে; কিন্তু পাঠকের মনোরঞ্জননের জন্য সস্তা ও সাময়িক ‘খেলনা’ তৈরি করা সাহিত্যের ধর্ম নয়। তাই সাহিত্যিককে বাহ্যিক উদ্দেশ্যের পরিবর্তে নিজের সৃষ্টিশীল আনন্দের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হবে।

– সাহিত্যে খেলা – প্রমথ চৌধুরী

৮. মূলপাঠের সংক্ষিপ্ত অংশ

কারণ পাঠকসমাজ যে-খেলনা আজ আদর করে, কাল সেটিকে ভেঙে ফেলে-সে প্রাচ্যই হোক আর পাশ্চাত্যই হোক, কাশীরই হোক আর জর্মানিরই হোক, দুদিন ধরে তা কারো মনোরঞ্জন করতে পারে না। আমি জানি যে, পাঠকসমাজকে আনন্দ দিতে গেলে তাঁরা প্রায়শই বেদনাবোধ করে থাকেন। কিন্তু এতে ভয় পাবার কিছুই নেই; কেননা কাব্যজগতে যার নাম আনন্দ, তারই নাম বেদনা।

তবে কি সাহিত্যের উদ্দেশ্য লোককে শিক্ষা দেওয়া?—অবশ্য নয়। কেননা কবির মতিগতি শিক্ষকের মতিগতির সম্পূর্ণ বিপরীত। স্কুল না বন্ধ হলে যে খেলার সময় আসে না, এ তো সকলেরই জানা কথা। কিন্তু সাহিত্যরচনা যে আত্মার লীলা, এ কথা শিক্ষকেরা স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। সুতরাং শিক্ষা ও সাহিত্যের ধর্ম কর্ম যে এক নয়, এ সত্যটি একটু স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেওয়া আবশ্যিক।

প্রথমত শিক্ষা হচ্ছে সেই বস্তু যা লোকে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও গলাধঃকরণ করতে বাধ্য হয়, অপরপক্ষে কাব্যরস লোকে শুধু স্বেচ্ছায় নয় সানন্দে পান করে; কেননা শাস্ত্রমতে সে রস অমৃত। দ্বিতীয়ত শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মনকে বিশ্বের খবর জানানো, সাহিত্যের উদ্দেশ্য মানুষের মনকে জাগানো; কাব্য যে সংবাদপত্র নয়, এ কথা সকলেই জানেন।

তৃতীয়ত অপরের মনের অভাব পূর্ণ করবার উদ্দেশ্যেই শিক্ষকের হস্তে শিক্ষা জন্মলাভ করেছে, কিন্তু কবির নিজের মনের পরিপূর্ণতা হতেই সাহিত্যের উৎপত্তি। সাহিত্যের উদ্দেশ্য যে আনন্দদান করা, শিক্ষাদান করা নয়, একটি উদাহরণের সাহায্যে তার অকাট্য প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে। বাল্মীকি আদিতে মুনিঋষিদের জন্য রামায়ণ রচনা করেছিলেন, জনগণের জন্য নয়। বড়ো বড়ো মুনিঋষিদের কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়া তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু রামায়ণ শ্রবণ করে মহর্ষিরাও যে কতদূর আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলেন তার প্রমাণ তাঁরা কুশীলবকে তাঁদের যথাসর্বস্ব, এমন-কি, কৌপীন পর্যন্ত, পেলা দিয়েছিলেন।

কাব্যরস নামক অমৃতে যে আমাদের অরুচি জন্মেছে, তার জন্য দায়ী এ যুগের স্কুল এবং তার মাস্টার। কাব্য পড়বার ও বোঝবার জিনিস, কিন্তু স্কুলমাস্টারের কাজ হচ্ছে বই পড়ানো ও বোঝানো। লেখক এবং পাঠকের মধ্যে এখন স্কুলমাস্টার দণ্ডায়মান। এই মধ্যস্থদের কৃপায় আমাদের সঙ্গে কবির মনের মিলন দূরে যাক, চার চক্ষুর মিলনও ঘটে না। স্কুলঘরে আমরা কাব্যের রূপ দেখতে পাই নে, শুধু তার গুণ শুনি।

সাহিত্য শিক্ষার ভার নেয় না, কেননা মনোজগতে শিক্ষকের কাজ হচ্ছে কবির কাজের ঠিক উলটো। কারণ কবির কাজ হচ্ছে কাব্য সৃষ্টি করা, আর শিক্ষকের কাজ হচ্ছে প্রথমে তা বধ করা তার পরে তার শবচ্ছেদ করা, এবং ঐ উপায়ে তার তত্ত্ব আবিষ্কার করা ও প্রচার করা। এই-সব কারণে নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, কারো মনোরঞ্জন করাও সাহিত্যের কাজ নয়, কাউকে শিক্ষা দেওয়াও নয়। সাহিত্য ছেলের হাতের খেলনাও নয়, গুরু হাতের বেতও নয়। সাহিত্যে মানবাত্মা খেলা করে এবং সেই খেলার আনন্দ উপভোগ করে।

সারসংক্ষেপ

পাঠকের সাময়িক পছন্দ পূরণ করা সাহিত্যের লক্ষ্য নয়, কারণ আজকের জনপ্রিয় সৃষ্টি কালই বিস্মৃত হতে পারে। একইভাবে সাহিত্যের উদ্দেশ্য সরাসরি শিক্ষা দেওয়াও নয়। শিক্ষার কাজ মানুষকে বিশ্বের তথ্য জানানো, আর সাহিত্যের কাজ মানুষের অন্তরকে জাগিয়ে তোলা। শিক্ষা গ্রহণ করা হয় প্রয়োজনের তাগিদে; কিন্তু সাহিত্য মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে গ্রহণ করে। কবির অন্তরের পরিপূর্ণতা ও সৃষ্টির আনন্দ থেকেই সাহিত্যের জন্ম। অতিরিক্ত টীকা, ব্যাখ্যা ও শিক্ষামূলক বিশ্লেষণ অনেক সময় পাঠককে সাহিত্যরস থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। তাই সাহিত্য কোনো খেলনা নয়, আবার শিক্ষকের বেতও নয়; মানবাত্মার স্বাধীন ও আনন্দময় লীলাই সাহিত্যসৃষ্টির মূল কথা।

– সাহিত্যে খেলা – প্রমথ চৌধুরী

অবশ্যই। আগের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী ‘সাহিত্যে খেলা’ প্রবন্ধের ৭ ও ৮ দিচ্ছি। প্রথমে মূলপাঠের অংশ, এরপর তার সারসংক্ষেপ-মূল বক্তব্য ও ঘটনাক্রম ঠিক রেখে, তবে সারসংক্ষেপটি পরীক্ষোপযোগী ও স্মার্টভাবে।

৭. মূলপাঠ

কারণ পাঠকসমাজ যে-খেলনা আজ আদর করে, কাল সেটিকে ভেঙে ফেলে-সে প্রাচ্যই হোক আর পাশ্চাত্যই হোক, কাশীরই হোক আর জার্মানিরই হোক, দুদিন ধরে তা কারো মনোরঞ্জন করতে পারে না। আমি জানি যে, পাঠকসমাজকে আনন্দ দিতে গেলে তাঁরা প্রায়শই বেদনাবোধ করে থাকেন। কিন্তু এতে ভয় পাবার কিছুই নেই; কেননা কাব্যজগতে যার নাম আনন্দ, তারই নাম বেদনা। সে যাই হোক, পরের মনোরঞ্জন করতে গেলে সরস্বতীর বরপুত্রও যে নটবিটের দলভুক্ত হয়ে পড়েন তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ স্বয়ং ভারতচন্দ্র। কৃষ্ণচন্দ্রের মনোরঞ্জন করতে বাধ্য না হলে তিনি বিদ্যাসুন্দর রচনা করতেন না, কিন্তু তাঁর হাতে বিদ্যা ও সুন্দরের অপূর্ব মিলন সংঘটিত হত; কেননা কহড়িবিবফমব এবং ধৎ উভয়ই তাঁর সম্পূর্ণ করায়ত্ত ছিল।

বিদ্যাসুন্দর খেলনা হলেও রাজার বিলাসভবনের পাঞ্চালিকা-সুবর্ণে গঠিত, সুগঠিত এবং মণিমুক্তায় অলংকৃত। তাই আজও তার যথেষ্ট মূল্য আছে, অন্তত জহুরীর কাছে। অপরপক্ষে এ যুগে পাঠক হচ্ছে জনসাধারণ, সুতরাং তাঁদের মনোরঞ্জন করতে হলে আমাদের অতি সস্তা খেলনা গড়তে হবে, নইলে তা বাজারে কাটবে না। এবং সস্তা করার অর্থ খেলো করা। বৈশ্য লেখকের পক্ষেই শূদ্র পাঠকের মনোরঞ্জন করা সংগত। অতএব সাহিত্যে আর যাই কর-না-কেন, পাঠকসমাজের মনোরঞ্জন করবার চেষ্টা করো না।

সারসংক্ষেপ

প্রমথ চৌধুরীর মতে, পাঠকের সাময়িক রুচি ও মনোরঞ্জনের জন্য সাহিত্য সৃষ্টি করা উচিত নয়। কারণ যে সাহিত্য আজ জনপ্রিয়, কাল তা অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়তে পারে। কেবল পাঠককে খুশি করার চেষ্টা করলে সাহিত্যিককে নিজের সৃষ্টিশীলতা ও শিল্পীসত্তার সঙ্গে আপস করতে হয়। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর রচনার প্রসঙ্গ টেনে লেখক দেখিয়েছেন, রাজদরবারের মনোরঞ্জনের প্রয়োজন থাকলেও তাঁর শিল্পপ্রতিভা সেই রচনাকে স্থায়ী মূল্য দিয়েছে। তাই সাহিত্যকে সস্তা জনপ্রিয়তার পেছনে না ছুটে নিজস্ব শিল্পমূল্য ও আনন্দের ভিত্তিতে সৃষ্টি করতে হবে।

– সাহিত্যে খেলা, প্রমথ চৌধুরী

৮. মূলপাঠ

তবে কি সাহিত্যের উদ্দেশ্য লোককে শিক্ষা দেওয়া?—অবশ্য নয়। কেননা কবির মতিগতি শিক্ষকের মতিগতির সম্পূর্ণ বিপরীত। স্কুল না বন্ধ হলে যে খেলার সময় আসে না, এ তো সকলেরই জানা কথা। কিন্তু সাহিত্যরচনা যে আত্মার লীলা, এ কথা শিক্ষকেরা স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। সুতরাং শিক্ষা ও সাহিত্যের ধর্ম কর্ম যে এক নয়, এ সত্যটি একটু স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেওয়া আবশ্যিক। প্রথমত শিক্ষা হচ্ছে সেই বস্তু যা লোকে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও গলাধঃকরণ করতে বাধ্য হয়, অপরপক্ষে কাব্যরস লোকে শুধু স্বেচ্ছায় নয় সানন্দে পান করে; কেননা শাস্ত্রমতে সে রস অমৃত। দ্বিতীয়ত শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মনকে বিশ্বের খবর জানানো, সাহিত্যের উদ্দেশ্য মানুষের মনকে জাগানো; কাব্য যে সংবাদপত্র নয়, এ কথা সকলেই জানেন।

তৃতীয়ত অপরের মনের অভাব পূর্ণ করবার উদ্দেশ্যেই শিক্ষকের হস্তে শিক্ষা জন্মলাভ করেছে, কিন্তু কবির নিজের মনের পরিপূর্ণতা হতেই সাহিত্যের উৎপত্তি। সাহিত্যের উদ্দেশ্য যে আনন্দদান করা, শিক্ষাদান করা নয়, একটি

উদাহরণের সাহায্যে তার অকাট্য প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে। বাল্মীকি আদিতো মুনিঋষিদের জন্য রামায়ণ রচনা করেছিলেন, জনগণের জন্য নয়। এ কথা বলা বাহুল্য যে, বড়ো বড়ো মুনিঋষিদের কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়া তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু রামায়ণ শ্রবণ করে মহর্ষিরাও যে কতদূর আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলেন তার প্রমাণ তাঁরা কুশীলবকে তাঁদের যথাসর্বস্ব, এমন-কি, কৌপীন পর্যন্ত, পেলা দিয়েছিলেন। রামায়ণ কাব্য হিসাবে যে অমর এবং জনসাধারণ আজও যে তার শ্রবণে-পঠনে আনন্দ উপভোগ করে তার একমাত্র কারণ, আনন্দের ধর্মই এই যে তা সংক্রামক। অপরপক্ষে লাখে একজনও যে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের ছায়া মাড়ান না তার কারণ, সে বস্তু লোককে শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল, আনন্দ দেবার জন্যে নয়। আসল কথা এই যে, সাহিত্য কল্পনাকালেও স্কুলমাস্টারির ভার নেয় নি। এতে দুঃখ করবার কোনো কারণ নেই। দুঃখের বিষয় এই যে, স্কুলমাস্টারেরা একালে সাহিত্যের ভার নিয়েছেন।

সারসংক্ষেপ

সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য শিক্ষা দেওয়া নয়; মানুষের মনকে জাগানো ও আনন্দ দেওয়া। শিক্ষার কাজ মানুষকে বিশ্বের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান দেওয়া, আর সাহিত্যের কাজ মানুষের অনুভূতি ও কল্পনাশক্তিকে জাগ্রত করা। শিক্ষা অনেক সময় বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করতে হয়, কিন্তু কাব্যরস মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে গ্রহণ করে। বাল্মীকি রচিত রামায়ণ এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ-এটি শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে নয়, আনন্দ ও সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ হিসেবে অমর হয়েছে। বিপরীতে যে রচনা কেবল শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তৈরি, তা সাধারণ মানুষের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারে না। তাই সাহিত্যকে শিক্ষকের বেত বা পাঠ্যবইয়ের মতো না দেখে আত্মার আনন্দময় সৃষ্টিলীলা হিসেবে গ্রহণ করা উচিত।

– সাহিত্যে খেলা, প্রমথ চৌধুরী

বিলাসী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মূলপাঠ

পাকা দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া স্কুলে বিদ্যা অর্জন করিতে যাই। আমি একা নই-দশ-বারোজন। যাহাদেরই বাটী পল্লিগ্রামে, তাহাদেরই ছেলেদের শতকরা আশিজনকে এমনি করিয়া বিদ্যালভ করিতে হয়। ইহাতে লাভের অঙ্কে শেষ পর্যন্ত একেবারে শূন্য না পড়িলেও, যাহা পড়ে, তাহাতে হিসাব করিবার পক্ষে এই কয়টা কথা চিন্তা করিয়া দেখিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যে ছেলেদের সকাল আটটার মধ্যে বাহির হইয়া যাতায়াতে চার ক্রোশ পথ ভাঙিতে হয়-চার ক্রোশ মানে আট মাইল নয়, ঢের বেশি-বর্ষার দিনে মাথার ওপর মেঘের জল পায়ের নিচে এক হাঁটু কাদা এবং গ্রীষ্মের দিনে জলের বদলে কড়া সূর্য এবং কাদার বদলে ধুলার সাগর সাঁতার দিয়া স্কুল-ঘর করিতে হয়, সেই দুর্ভাগা বালকদের মা-সরস্বতী খুশি হইয়া বর দিবেন কি, তাহাদের যত্ননা দেখিয়া কোথায় যে তিনি লুকাইবেন, ভাবিয়া পান না।

তারপরে এই কৃতবিদ্য শিশুর দল বড় হইয়া একদিন গ্রামেই বসুন, আর ক্ষুধার জ্বালায় অন্যত্রই যান-তাঁদের চার ক্রোশ হাঁটা বিদ্যার তেজ আত্মপ্রকাশ করিবেই করিবে।

কেহ কেহ বলেন গুনিয়াছি, আচ্ছা, যাঁদের ক্ষুধার জ্বালা, তাঁদের কথা না হয় নাই ধরলাম কিন্তু যাঁদের সে জ্বালা নাই, তেমন সব ভদ্রলোকই বা কী সুখে গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করেন?

তঁারা বাস করিতে থাকিলে তো পল্লির এত দুর্দশা হয় না।

ম্যালেরিয়া কথাটা না হয় নাই পাড়িলাম।

সে থাক, কিন্তু ওই চার ক্রোশ হাঁটার জ্বালায় কত ভদ্রলোকেই যে ছেলে-পুতে লইয়া গ্রাম ছাড়িয়া শহরে পালান তাহার আর সংখ্যা নাই।

তারপরে একদিন ছেলে-পুত্রে পড়াও শেষ হয় বটে, তখন কিন্তু শহরের সুখ-সুবিধা রুচি লইয়া আর তাদের গ্রামে ফিরিয়া আসা চলে না।

কিন্তু থাক এ-সকল বাজে কথা।

স্কুলে যাই-দুক্রোশের মধ্যে এমন আরও তো দুই তিনখানা গ্রাম পার হইতে হয়।

সারসংক্ষেপ

গ্রামের শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে যেতে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়, যা তাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর। বর্ষায় কাদা ও বৃষ্টির এবং গ্রীষ্মে রোদ ও ধুলার মধ্যে তাদের স্কুলে যেতে হয়। এই দুর্ভোগের কারণে অনেক পরিবার গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে যায়। শহরের সুযোগ-সুবিধায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ায় পরে তাদের গ্রামে ফিরে আসা কঠিন হয়। ফলে গ্রাম ক্রমে শিক্ষিত ও কর্মক্ষম মানুষশূন্য হয়ে পড়ে এবং পল্লির উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়।

বিলাসী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মূলপাঠ

কাজেই একজামিনের সময় এডেন কী জিজ্ঞাসা করিলে বলি পারশিয়ার বন্দর, আর হুমায়ূনের বাপের নাম জানিতে চাহিলে লিখিয়া দিয়া আসি তোগলক খাঁ এবং আজ চল্লিশের কোঠা পার হইয়াও দেখি, ও-সকল বিষয়ের ধারণা প্রায় একরকমই আছে-তারপরে প্রমোশনের দিন মুখ ভার করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া কখনো বা দল বাঁধিয়া মতলব করি, মাস্টারকে ঠ্যাগানো উচিত, কখনো বা ঠিক করি, অমন বিশ্রী স্কুল ছাড়িয়া দেওয়াই কর্তব্য।

আমাদের গ্রামের একটি ছেলের সঙ্গে মাঝে মাঝেই স্কুলের পথে দেখা হইত। তাহার নাম ছিল মৃত্যুঞ্জয়। আমাদের চেয়ে সে বয়সে অনেক বড়। থার্ড ক্লাসে পড়িত। কবে সে যে প্রথম থার্ড ক্লাসে উঠিয়াছিল, এ খবর আমরা কেহই জানিতাম না- সম্ভবত তাহা প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয়-আমরা কিন্তু তাহার ওই থার্ড ক্লাসটাই চিরদিন দেখিয়া আসিয়াছি।

তাহার ফোর্থ ক্লাসে পড়ার ইতিহাসও কখনো শুনি নাই, সেকেন্ড ক্লাসে উঠিবার খবরও কখনো পাই নাই।

মৃত্যুঞ্জয়ের বাপ-মা, ভাই-বোন কেহই ছিল না, ছিল শুধু গ্রামের এক প্রান্তে একটা প্রকাণ্ড আম-কাঁঠালের বাগান, আর তার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড পোড়োবাড়ি, আর ছিল এক জ্ঞাতি খুড়া।

খুড়ার কাজ ছিল ভাইপোর নানাবিধ দুর্নাম রটনা করা-সে গাঁজা খায়, সে গুলি খায়, এমনি আরও কত কি!

তঁার আর একটা কাজ ছিল বলিয়া বেড়ানো, ওই বাগানের অর্ধেকটা তঁার নিজের অংশ, নালিশ করিয়া দখল করার অপেক্ষা মাত্র।

অবশ্য দখল একদিন তিনি পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে জেলা-আদালতে নালিশ করিয়া নয়-ওপরের আদালতের হুকুমে।

কিন্তু সে কথা পরে হইবে।

মৃত্যুঞ্জয় নিজে রাঁধিয়া খাইত এবং আমের দিনে ওই আম-বাগানটা জমা দিয়াই তাহার সারা বৎসরের খাওয়া-পরা চলিত এবং ভালো করিয়াই চলিত।

সারসংক্ষেপ

মৃত্যুঞ্জয় গ্রামের এক বয়স্ক ছাত্র, যে দীর্ঘদিন ধরে একই শ্রেণিতে পড়ছিল। তার বাবা-মা, ভাই-বোন কেউ ছিল না; ছিল একটি বড় আম-কাঁঠালের বাগান, একটি পোড়োবাড়ি এবং এক জ্ঞাতি খুড়া। খুড়া মৃত্যুঞ্জয়ের নামে নানা অপবাদ ছড়াতেন এবং তার সম্পত্তির অংশ দখলের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন। অন্যদিকে মৃত্যুঞ্জয় নিজেই রান্না করে খেত এবং বাগানের আয়েই সারা বছরের জীবনযাপন করত।

১১. অর্ধাঙ্গী – রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ‘অর্ধাঙ্গী’ প্রবন্ধে নারীজাতির সামাজিক ও মানসিক অবনতির মূল কারণ হিসেবে দাসত্বকে চিহ্নিত করেছেন। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, নারীর উন্নতির জন্য শুধু পর্দাপ্রথা দূর করাই যথেষ্ট নয়; মানসিক দাসত্ব থেকেও মুক্ত হওয়া প্রয়োজন। সমাজে নারী ও পুরুষকে সমান মর্যাদা ও সুযোগ না দেওয়ায় সংসার নামের দ্বিচক্র্যানের একটি চাকা দুর্বল হয়ে পড়েছে। তিনি ব্যঙ্গাত্মকভাবে দেখিয়েছেন, পুরুষেরা জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চা করলেও নারীদের অনেক সময় রান্নাবান্না ও সেলাইয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়। ফলে নারী শিক্ষার অভাবে নিজের অধিকার ও সামর্থ্য সম্পর্কে সচেতন হতে পারে না। রোকেয়া মনে করেন, রান্না ও সেলাইয়ের মতো প্রয়োজনীয় কাজ শেখার পাশাপাশি নারীর উচ্চশিক্ষা ও মানসিক বিকাশেরও সুযোগ থাকা উচিত। তিনি ধর্ম বা সম্প্রদায় ত্যাগের কথা বলেননি; বরং নিজ নিজ ধর্মীয় ও সামাজিক পরিচয় বজায় রেখেই নারীর চিন্তাকে স্বাধীন করার পক্ষে মত দিয়েছেন। তাঁর মতে, নারীকে পুরুষের অধীন না রেখে জীবনের সমান সহচর হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। নারী ও পুরুষের সমান শিক্ষা, অনুশীলন ও সুযোগ নিশ্চিত হলেই সমাজ ও দেশ প্রকৃত উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারবে।

সারসংক্ষেপ :

‘অর্ধাঙ্গী’ প্রবন্ধে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন নারী-পুরুষের বৈষম্যের বিরুদ্ধে যুক্তি তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, নারীকে অশিক্ষা ও মানসিক দাসত্ব থেকে মুক্ত করে সমান সুযোগ দিতে হবে। সংসার ও সমাজের উন্নতির জন্য নারী-পুরুষ উভয়ের সমান ভূমিকা অপরিহার্য। রান্না ও সেলাইয়ের পাশাপাশি নারীর উচ্চশিক্ষা, স্বাধীন চিন্তা ও আত্মমর্যাদার বিকাশ ঘটাতে হবে। নারীকে প্রকৃত অর্ধাঙ্গী হিসেবে মর্যাদা দেওয়ার মধ্য দিয়েই সমাজের পূর্ণাঙ্গ উন্নতি সম্ভব।

১২. অর্ধাঙ্গী – রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ‘অর্ধাঙ্গী’ প্রবন্ধে নারীকে পুরুষের সমান মর্যাদা ও অধিকার দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন, নারীর অবনতির প্রধান কারণ মানসিক দাসত্ব এবং শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়া। তাঁর মতে, সংসার একটি দ্বিচক্র্যানের মতো; এর একটি চাকা পুরুষ এবং অন্যটি নারী। একটি চাকা দুর্বল হলে সেই সংসার ও সমাজের অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হয়। তিনি ব্যঙ্গ করে দেখিয়েছেন, পুরুষেরা যখন জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করেন, তখন নারীদের অনেক সময় রান্নাঘরের কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়। তাই নারীর শিক্ষা শুধু রান্না ও সেলাই শেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে জ্ঞান ও চিন্তার বিস্তৃত জগতে নিয়ে যেতে হবে। নারীকে শারীরিকভাবে দুর্বল বলে পুরুষের অধীন মনে করা যুক্তিসংগত নয়, কারণ সমাজে প্রত্যেক মানুষই অন্যের সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল।

সমান শিক্ষা ও অনুশীলনের সুযোগ পেলে নারীরাও নিজেদের যোগ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে সক্ষম হবে। নারীর আত্মমর্যাদা, স্বাধীন চিন্তা ও কর্মদক্ষতার বিকাশ ঘটলেই সমাজের প্রকৃত উন্নতি সম্ভব।

সারসংক্ষেপ :

‘অর্ধাঙ্গী’ প্রবন্ধে রোকেয়া নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করে নারীর সমান অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। তিনি মনে করেন, নারীর পশ্চাৎপদতার মূল কারণ অশিক্ষা ও মানসিক দাসত্ব। তাই নারীদের যথাযথ শিক্ষা, অনুশীলন ও স্বাধীন চিন্তার সুযোগ দিতে হবে। নারী ও পুরুষের সমান অংশগ্রহণেই সংসার, সমাজ ও দেশের সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব।

১৩. যৌবনের গান – কাজী নজরুল ইসলাম

মূলপাঠ

যাঁহারা মানব জাতির কল্যাণ সাধন করেন সেবা দিয়া, কর্ম দিয়া, তাঁরারা মহৎ যদি না-ই হন, অন্তত ক্ষুদ্র নন। ইহারা থাকেন শক্তির পেচনে রুধির ধারা মতো গোপন, ফুলের মাঝে মাটির মমতা-রসের মতো অলক্ষ্যে। আমি কবি-বনের পাখির মতো স্বভাব আমার গান করার। কাহারও ভালো লাগিলেও গাই, ভালো না লাগিলেও গাইয়া যাই। বায়স ভিঙে যখন বেচারা গানের পাখিকে তাড়া করে, তীক্ষ্ণ চঞ্চু দ্বারা আঘাত করে, তখনও সে এক গাছ হইতে উড়িয়া আন গাছে গিয়া গান ধরে। তাহার হাসিতে গান, তাহার কান্নায় গান। সে গান করে আপন মনোর আনন্দে-যদি তাহাতে কাহারও অলস-তন্দ্রা, মোহ-নিদ্রা টুটিয়ে যায়, তাহার একান্ত গান তারুণ্যের ভরা-ভাদরে যদি আমরা গান জোয়ার অনিয়া থাকে, তাহা আমার আগোচরে; যে চাঁদা সাগরে জোয়ার জাগায়, সে যহত তাহার শক্তির সম্বন্ধে আজ ও না-ওয়াকিফ।

আমি বক্তাও নহি। আমি কমরবক্তার দলে। বক্তৃতায় যাঁহারা দিগ্বিজয়ী, বক্তিয়ায় খিলজি, তাঁহাদের বাক্যের সৈন্য সামন্ত অত দ্রুতবেগে কোথা হইতে কেমন করিয়া আসে বলিতে পারি না। তাহা দেখিয়া লক্ষণ সেন আপেক্ষা ও আমার বেশি অভিভূত হইয়া পড়ি। তাঁহাদের বাণী আসে বৃষ্টিধারায় মতো অবিরল ধারায়। আমাদের কবিদের বাণী বহে ক্ষীর্ণ ভীর্ণ ঝরনাধারায় মতো। ছন্দের দুকূল প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরিয়া সে সঙ্গীত গুঞ্জন করিতে করিতে বহিয়া যায়। পদ্মা ভাগীরথীর মতো খরস্রোতা যাঁহাদের বাণী, আমি তাঁহাদের বহু পশ্চাতে। আমার একমাত্র সম্বল-আপনাদের তারুণ্যের প্রতি আমার অপরিসীম ভালোবাসা, প্রাণের টান।

তারুণ্যকে, যৌবনকে, আমি যেদিন হইতে গান গাহিতে শিখিয়াছি, সেদিন হইতে বারে বারে সালাম করিয়াছি, সশ্রদ্ধ নমস্কার নিবেদন করিয়াছি, জবাকুসুমসঙ্ককাশ তরুণ অরুণকে দেখিয়া প্রথম মানব মেয়ন করিয়া সশ্রদ্ধ নমস্কার করিয়াছিলেন, আমার প্রথম জাগরণ প্রভাবে তেমন সশ্রদ্ধ বিশ্বাস লইয়া যৌবনকে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছি, তাহার স্তবগনা গাইয়াছি। তরুণ অরুণের মতোই যে তারুণ্য তিমিরি বিদারী, সে যে আলোর দেবতা। রঙের খেলা খেলিতে খেলিতে তাহার উদয়, রং ছড়াইতে ছড়াইতে তাহার অস্ত। যৌবন সূর্য যথায় অন্তিমিত, দুঃখের তিমির কুন্তলা নিশীথিনীর সেই তো লীলভূমি।

সারসংক্ষেপ

মানবজাতির কল্যাণে সেবা ও কর্মে নিয়োজিত মানুষই প্রকৃতপক্ষে মহৎ। কবি নিজেকে বক্তা নয়, বরং গান গাওয়া কবি হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন এবং প্রতিকূলতার মধ্যেও গান গেয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন। তারুণ্যের প্রতি তাঁর অপরিসীম ভালোবাসা ও প্রাণের টানই তাঁর প্রধান সম্বল। তিনি তারুণ্য ও যৌবনকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখেছেন

এবং তাকে অন্ধকার দূরকারী আলোর দেবতা হিসেবে অভিহিত করেছেন। তাঁর কাছে যৌবন হলো প্রাণশক্তি, উদ্দীপনা ও আলোর প্রতীক। যৌবনের আলো নিভে গেলে দুঃখ ও অন্ধকার পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে।

১৪. যৌবনের গান – কাজী নজরুল ইসলাম

মূলপাঠ

আমি যৌবনের পূজারী কবি বলিয়াই যদি আমার আপনারা আপনাদের মালার মধ্যমণি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার অভিযোগ করিবার কিছুই নাই। আপনাদের মহাদান আমি সানন্দে শির নত করিয়া গ্রহণ করিলাম। আপনাদের দলপতি হইয়া নয়, আপনাদের দলভুক্ত হইয়া, সহযাত্রী হইয়া। আমাদের দলে কেহ দলপতি নাই, আজ আমরা শত দিক হইতে শত শত তরুণ মিলিয়ে তারুণ্যের শতদল ফুটাইয়া তুলিয়াছি। আমার সকলে মিলিয়া এক সিদ্ধি, এক ধ্যানের মৃগাণ ধরিয়া বিকশিত তহইতে চাই।

বার্ধক্য তাহাই-যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃত্যুকে আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকে, বৃদ্ধ তাহারাই-যাহারা মায়াচ্ছন্ন নব মানবের অভিনব জয় যাত্রার শুধু বোঝা নয়, বিঘ্ন; শতাব্দীর নব যাত্রীর চলার ছন্দে ছন্দ মিলাইয়া যাহারা কুচকাওয়াজ করিতে জানে না, পারে না; যাহারা জীব হইয়াও জড়; যাহারা অটল সংস্কারের পাষণ্ডপুণ্ড আঁকড়িয়া পড়িয়া আছে। বৃদ্ধ তাহারাই যাহারা নব অরুণোদয় দেখিয়া নিদ্রাভঙ্গের ভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া পড়িয়া থাকে। আলোক পিয়াসী প্রাণ চঞ্চল শিশুদের কল কোলাহলে যাহারা বিরক্ত তহইয়া অভিসম্পাত করিতে থাকে জীর্ণ পুঁতি চাপা পড়িয়া যাহাদের নাভিশ্বাস বহিতেছে, অতি জ্ঞানের অগ্নিমান্দের যাহারা আজ কঙ্কালসার বৃদ্ধ তাহারাই। ইহাদের ধর্মই বার্ধক্য। বার্ধক্যকে সব সময় বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না। বহু যুবককে দেখিয়াছি যাহাদের যৌবনের উর্দির নিচে বার্ধক্যের কঙ্কাল মূর্তি।

আবার বহু বৃদ্ধকে দেখিয়াছি- যাহাদের বার্ধক্যের জীর্ণাবরণের তলে মেঘলুপ্ত সূর্যের মতো প্রদীপ্ত যৌবন। তরুণ নামের জয়-মুকুট শুধু তাহারই যাহার শক্তি অপরিমাণ, গতিবেগ ঝঞ্ঝার ন্যায়, তেজ নির্মেঘ আষাঢ় মধ্যাহ্নের মার্তন্ডপ্রায়, বিপুল যাহার আশা, ক্লাস্তিহীন যাহার উৎসাহ, বিরাট যাহার ঔদার্য, অফুরন্ত যাহার প্রাণ, অটল যাহার সাধনা, মৃত্যু যাহার মুঠিতলে। তারুণ্য দেখিয়াছি আরবের বেদুইনদের মাঝে, তারুণ্য দেখিয়াছি মহাসমরে সৈনিকের মুখে, কালাপাহাড়ের অসিতে, কামাল-করিম-মুসোলিনি-সানইয়াৎ লেনিনের শক্তিতে। যৌবন দেখিয়াছি তাহাদের মাঝে- যাহারা বৈমানিকরূপে অনন্ত আকাশের সীমা খুঁজিতে গিয়া প্রাণ হারায়, আবিষ্কাররূপে নব-পৃথিবীর সন্ধান গিয়া আর ফিরে না, গৌরীশৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘার শীর্ষদেশ অধিকার করিতে গিয়া যাহারা তুষার-ঢাকা পড়ে, অতল সমুদ্রের নীল মঞ্জুষার মণি আহরণ করিতে গিয়া সলিলসমাধি লাভ করে, মঙ্গলগ্রহে, চন্দ্রলোকে যাইবার পথ আবিষ্কার করিতে গিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া যায়। পবন-গতিকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাহারা উড়িয়া যাইতে চায়, নব নব গ্রহ-নক্ষত্রের সন্ধান করিতে করিতে যাহাদের নয়ন-মণি নিভিয়া যায়- যৌবন দেখিয়াছি সেই দুরন্তদের মাঝে। যৌবনের মাতৃরূপ দেখিয়াছি- শব বহন করিয়া যখন সে যায় শ্মশানঘাটে, গোরস্থানে, অনাহারে থাকিয়া যখন সে অনু পরিবেশন করে দুর্ভিক্ষ বন্যা-পীড়িতদের মুখে, বন্ধুহীন রোগীর শয্যাপার্শ্বে যখন সে রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া পরিচর্যা করে, যখন সে পথে পথে গান গাহিয়া ভিখারী সাজিয়া দুর্দশাগ্রস্তদের জন্য ভিক্ষা করে, যখন দুর্বলের পাশে বল হইয়া দাঁড়ায়, হতাশের বুকে আশা জাগায়।

সারসংক্ষেপ

কবি তরুণদের সঙ্গে নিজেকে একজন সহযাত্রী হিসেবে দেখেছেন এবং তারুণ্যের সম্মিলিত শক্তিতে নতুন কিছু সৃষ্টি করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে, বার্ধক্য শুধু বয়সের পরিচয় নয়; পুরোনো ও জীর্ণ সংস্কার আঁকড়ে থাকা

এবং নতুনকে গ্রহণ করতে না পারাই প্রকৃত বার্বাক্য। আবার বয়সে বৃদ্ধ হলেও যার মধ্যে শক্তি, আশা, উৎসাহ, ঔদার্য ও সাধনা রয়েছে, সে প্রকৃত তরুণ। সাহসী অভিযাত্রী, আবিষ্কারক ও দুরন্ত কর্মীদের মধ্যে কবি যৌবনের শক্তি প্রত্যক্ষ করেছেন। একই সঙ্গে দুর্ভিক্ষপীড়িতকে অন্নদান, অসুস্থের সেবা, দুর্বলের পাশে দাঁড়ানো এবং হতাশ মানুষের মনে আশা জাগানোর মধ্যেও তিনি যৌবনের মানবিক রূপ দেখতে পেয়েছেন। তাঁর কাছে প্রকৃত যৌবন হলো শক্তি, সাহস, কর্মপ্রেরণা, সাধনা ও মানবসেবার সমন্বিত রূপ।

১৫. জীবন ও বৃক্ষ – মোতাহের হোসেন চৌধুরী

মূলপাঠ

এদের স্থানে এনে দিতে হবে বড় মানুষ– সূক্ষ্মবুদ্ধি উদারহৃদয় গভীরচিন্তা ব্যক্তি, যাদের কাছে বড় হয়ে উঠবে জীবনের বিকাশ, কেবল টিকে থাকা নয়। তাদের কাছে জীবনাদর্শের প্রতীক হবে প্রাণহীন ছাঁচ বা কল নয়, গতি আছে, সজীব বৃক্ষ– যার বৃদ্ধি আছে, বিকাশ আছে, ফুলে ফলে পরিপূর্ণ হয়ে অপরের সেবার জন্য প্রস্তুত হওয়া যার কাজ। বৃক্ষের জীবনের গতি ও বিকাশকে উপলব্ধি করা দরকার, নইলে সার্থকতা ও পরিপূর্ণতার ছবি চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হবে না।

বৃক্ষের দিকে তাকালে জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি সহজ হয়। তাই, বারবার সেদিকে তাকানো প্রয়োজন। মাটির রস টেনে নিয়ে নিজেকে মোটাসোটা করে তোলাতেই বৃক্ষের কাজের সমাপ্তি নয়। তাকে ফুল ফোটাতে হয়, ফল ধরাতে হয়। নইলে তার জীবন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই বৃক্ষকে সার্থকতার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা সজীবতা ও সার্থকতার এমন জীবন্ত দৃষ্টান্ত আর নেই।

সাধনার ব্যাপারে প্রাপ্তি একটা বড় জিনিস। নদীর সাগরে পতিত হওয়ায় সেই প্রাপ্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। সে তো প্রাপ্তি নয়, আত্মবিসর্জন। অপরপক্ষে বৃক্ষের প্রাপ্তি চোখের সামনে ছবি হয়ে ফুটে ওঠে। ফুলে ফলে যখন সে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তখন আপনা থেকেই বলতে ইচ্ছা হয় : এই তো সাধনার সার্থকতা। বৃক্ষে প্রাপ্তি ও দান। সৃজনশীল মানুষেরও প্রাপ্তি ও দানে পার্থক্য দেখা যায় না। যা তার প্রাপ্তি তা-ই তার দান।

সারসংক্ষেপ

জীবনের আদর্শ কেবল টিকে থাকা নয়, বরং বিকাশ ও পরিপূর্ণতা অর্জন করা। লেখক সজীব বৃক্ষকে মানুষের জীবনের সার্থকতার প্রতীক হিসেবে দেখিয়েছেন। বৃক্ষ মাটির রস গ্রহণ করে শুধু নিজের বৃদ্ধি ঘটায় না; ফুল ও ফলের মাধ্যমে সে অপরের উপকারে আসে। মানুষের জীবনেও আত্মবিকাশের পাশাপাশি অন্যের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করা প্রয়োজন। নদীর মতো শুধু ছুটে চলার পরিবর্তে বৃক্ষের মতো ধীরস্থির ও নীরব সাধনা মানুষের কাম্য। বৃক্ষের ফুলে-ফলে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠার মধ্য দিয়ে সাধনার প্রাপ্তি ও দানের সুন্দর সমন্বয় প্রকাশ পায়। সৃজনশীল মানুষের ক্ষেত্রেও নিজের অর্জনই অন্যের জন্য দানে পরিণত হয়।

থ

১৬. জীবন ও বৃক্ষ – মোতাহের হোসেন চৌধুরী

মূলপাঠ

নীরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের সার্থকতার গান গেয়ে শোনায়। অনুভূতির কান দিয়ে সে গান শুনতে হবে। তাহলে বুঝতে পারা যাবে জীবনের মানে বৃদ্ধি, ধর্মের মানেও তাই। প্রকৃতির যে ধর্ম মানুষের সে ধর্ম; পার্থক্য কেবল তরুণতা ও জীবজন্তুর বৃদ্ধির ওপর তাদের নিজেদের কোনো হাত নেই, মানুষের বৃদ্ধির ওপরে তার নিজের হাত রয়েছে। আর এখানেই মানুষের মর্যাদা। মানুষের বৃদ্ধি কেবল দৈহিক নয়, আত্মিকও।

মানুষকে আত্মা সৃষ্টি করে নিতে হয়, তা তৈরি পাওয়া যায় না। সুখ-দুঃখ-বেদনা উপলব্ধির ফলে অন্তরের যে পরিপক্বতা, তাই তো আত্মা। এই আত্মারূপ ফল স্রষ্টার উপভোগ্য। তাই মহাকবির মুখে শুনতে পাওয়া যায় : ‘জরঢ়বহবং রং ধষষ’- পরিপক্বতাই সব। আত্মাকে মধুর ও পুষ্ট করে গড়ে তুলতে হবে। নইলে তা স্রষ্টার উপভোগের উপযুক্ত হবে না। বিচিত্র অভিজ্ঞতা, প্রচুর প্রেম ও গভীর অনুভূতির দ্বারা আত্মার পরিপুষ্টি ও মাধুর্য সম্পাদন সম্ভব। তাই তাদের সাধনাই মানুষের শিক্ষার প্রধান বিষয়বস্তু। বস্তুজিজ্ঞাসা তথা বিজ্ঞান কখনো শিক্ষার প্রধান বিষয়বস্তু হতে পারে না। কেননা, তাতে আত্মার উন্নতি হয় না- জীবনবোধ ও মূল্যবোধে অন্তর পরিপূর্ণ হয় না; তা হয় সাহিত্য-শিল্পকলার দ্বারা। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের এত মূল্য।

ওপরে যে বৃদ্ধির কথা বলা হলো বৃক্ষের জীবন তার চমৎকার নিদর্শন। বৃক্ষের অঙ্কুরিত হওয়া থেকে ফলবান হওয়া পর্যন্ত সেখানে কেবলই বৃদ্ধির ইতিহাস। বৃক্ষের পানে তাকিয়ে আমরা লাভবান হতে পারি- জীবনের গূঢ় অর্থ সম্বন্ধে সচেতন হতে পারি বলে। বৃক্ষ যে কেবল বৃদ্ধির ইশারা তা নয়- প্রশান্তিরও ইঙ্গিত। অতি শান্ত ও সহিষ্ণুতায় সে জীবনের গুরুভার বহন করে।

সারসংক্ষেপ

বৃক্ষ নীরবে মানুষকে জীবনের সার্থকতার শিক্ষা দেয়। জীবনের অর্থ যেমন বৃদ্ধি, তেমনি মানুষের ধর্মও আত্মিক ও দৈহিক বিকাশ সাধন করা। উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর বৃদ্ধির ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ নেই, কিন্তু মানুষ নিজের আত্মিক উন্নতির জন্য সচেতনভাবে সাধনা করতে পারে- এটাই মানুষের মর্যাদা। সুখ-দুঃখ ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অন্তরের পরিপক্বতা অর্জিত হয়। প্রেম, গভীর অনুভূতি, সাহিত্য ও শিল্পকলার মাধ্যমে মানুষের জীবনবোধ ও মূল্যবোধ সমৃদ্ধ হয়। তাই শিক্ষার লক্ষ্য শুধু বৈজ্ঞানিক বা বস্তুগত জ্ঞান অর্জন নয়, আত্মার পরিপূর্ণতা সাধনও। বৃক্ষের অঙ্কুর থেকে ফলবান হয়ে ওঠা মানুষের বিকাশের এক সুন্দর দৃষ্টান্ত। একই সঙ্গে বৃক্ষ তার শান্তি ও সহিষ্ণুতার মাধ্যমে মানুষকে জীবনের ভার ধৈর্যের সঙ্গে বহন করার শিক্ষাও দেয়।

১৭. গন্তব্য কাবুল – সৈয়দ মুজতবা আলী

মূলপাঠ

চাঁদনি থেকে নয়সিকে দিয়ে একটা শার্ট কিনে নিয়েছিলুম। তখনকার দিনে বিচক্ষণ বাঙালির জন্য ইয়োরোপিয়ান থার্ড নামক একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান ভারতের সর্বত্র আনাগোনা করত। হাওড়া স্টেশনে সেই থার্ডে উঠতে যেতেই এক ফিরিঙ্গি হেঁকে বলল, “এটা ইয়োরোপিয়ানদের জন্য।”

আমি গাঁক গাঁক করে বললুম, “ইয়োরোপিয়ান তো কেউ নেই। চল, তোমাতে আমাতে ফাঁকা গাড়িটা কাজে লাগাই।” এক তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের বইয়ে পড়েছিলুম, “বাংলা শব্দের অন্ত্যদেশে অনুস্বার যোগ করিলে সংস্কৃত হয়; ইংরেজি শব্দের প্রাগদেশে জোর দিয়া কথা বলিলে সায়েবি ইংরেজি হয়।” অর্থাৎ পয়লা সিলেবলে অ্যাকসেন্ট দেওয়া খারাপ রান্নায় লক্ষা ঠেসে দেওয়ার মতো- সব পাপ ঢাকা পড়ে যায়। সোজা বাংলায় এরই নাম গাঁক গাঁক করে ইংরেজি বলা। ফিরিঙ্গি তালতলার নেটিভ, কাজেই আমার ইংরেজি শুনে ভারি খুশি হয়ে জিনিসপত্র গোছাতে সাহায্য করল।

সারসংক্ষেপ

লেখক কাবুল যাত্রার শুরুতে হাওড়া স্টেশনে একটি ইউরোপীয়দের জন্য নির্ধারিত তৃতীয় শ্রেণির কামরায় ওঠেন। এক ফিরিঙ্গি তাঁকে বাধা দিলে লেখক রসিকতার সঙ্গে ইংরেজিতে উত্তর দিয়ে তাঁকে নিজের সঙ্গে যাত্রার জন্য রাজি করান। নিজের উচ্চারণকে তিনি হাস্যরসের সঙ্গে ব্যাখ্যা করেছেন। ফিরিঙ্গিও লেখকের কথায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর

জিনিসপত্র গোছাতে সাহায্য করে। এই অংশে লেখকের রসবোধ, আত্মবিশ্বাস ও স্বতঃস্ফূর্ত কথনভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।

থ

১৮. গন্তব্য কাবুল – সৈয়দ মুজতবা আলী

মূলপাঠ

কিন্তু এদিকে আমার ভ্রমণের উৎসাহ ক্রমেই চূপসে আসছিল। এতদিন পাসপোর্ট জামাকাপড় যোগাড় করতে ব্যস্ত ছিলাম, অন্য কিছু ভাববার ফুরসত পাইনি। গাড়ি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম যে ভাবনা আমার মনে উদয় হলো সেটা অত্যন্ত কাপুরুষজনোচিত— মনে হলো আমি একা। ফিরিঙ্গিটি লোক ভালো। আমাকে গুম হয়ে শুয়ে থাকতে দেখে বলল, “এত মনমরা হলে কেন? গোলিং ফার?” দেখলুম, বিলিতি কায়দা জানে। “হোয়ার আর ইউ গোলিং?” বলল না।

সারসংক্ষেপ

যাত্রা শুরু হওয়ার পর লেখকের ভ্রমণের উৎসাহ কমে যায় এবং তিনি নিজেকে একা ও কিছুটা ভীত মনে করতে থাকেন। এতদিন পাসপোর্ট ও পোশাক-পরিচ্ছদ সংগ্রহের ব্যস্ততায় তিনি ভ্রমণের প্রকৃত অনুভূতি উপলব্ধি করার সুযোগ পাননি। তাঁর মনমরা ভাব দেখে সঙ্গে থাকা ফিরিঙ্গি তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে এবং তাঁর গন্তব্য সম্পর্কে জানতে চায়। এ অংশে অজানা পথে যাত্রার শুরুতে লেখকের মানসিক দ্বিধা ও নিঃসঙ্গতার অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে।

মূলগল্প থেকে

সেই থেকে শুরু হয় গেরস্তের বাড়তি শাকসবজি ফলমূল নিয়ে মাসি-পিসির সালতি বেয়ে শহরের বাজারে গিয়ে বেচে আসা। গাঁয়ের বাবু বাসিন্দারাও নগদ পয়সার জন্য বাগানের জিনিস বেচতে দেয়। মাসি-পিসির ভাব ছিল আগেও। অবস্থা এক, বয়স সমান, একঘরে বাস, পরস্পরের কাছে ছাড়া সুখ-দুঃখের কথা তারা কাকেই-বা বলবে, কেই-বা শুনবে। তবে হিংসা ঘেঁষে রেষারেষিও ছিল যথেষ্ট, কৌন্দল্যও বেধে যেত কারণে অকারণে। পিসি এ বাড়ির মেয়ে, এ তার বাপের বাড়ি। মাসি উড়ে এসে জুড়ে বসেছে এখানে। তাই মাসির উপর পিসির একটা অবজ্ঞা অবহেলার ভাব ছিল। এই নিয়ে পিসির অহংকার আর খোঁচাই সবচেয়ে অসহ্য লাগত মাসির। ধীরে ধীরে দুঃখী মানুষ মনে হতো এমনি তাদের, কিন্তু ঝগড়া বাধলে অবাক হয়ে যেতে হতো তাদের দেখে। সে কী রাগ, সে কী তেজ, সে কী গোঁ! মনে হতো এই বুঝি কামড়ে দেয় একে অপরকে, এই বুঝি কাটে বাঁটি দিয়ে।

শাকসবজি বেচে বাঁচবার চেষ্টায় একসঙ্গে কোমর বেঁধে নেমে পড়ামাত্র সব বিরোধ সব পার্থক্য উড়ে গিয়ে দুজনের হয়ে গেল একমন, একপ্রাণ। সে মিল জমজমাট হয়ে উঠল আল্লাহদির ভার ঘাড়ে পড়ায়। নিজের পেট ভরানো শুধু নয়, নিজেদের বেঁচে থাকা শুধু নয়, তাদের দুজনেরই এখন আল্লাহি আছে। খাইয়ে পরিয়ে যত্নে রাখতে হবে তাকে, শ্বশুরঘরের কবল থেকে বাঁচাতে হবে তাকে, গাঁয়ের বজ্রাতদের নজর থেকে সামলে রাখতে হবে, কত দায়িত্ব তাদের, কত কাজ, কত ভাবনা।

বাপ মা বেঁচে থাকলে আল্লাহদিকে হয়ত শ্বশুরবাড়ি যেতে হতো, মাসি-পিসিও বিশেষ কিছু বলতো কি না সন্দেহ। কিন্তু তারা তো নেই, এখন মাসি-পিসিরই সব দায়িত্ব। বিনা পরামর্শে আপনা থেকেই তাদের ঠিক হয়েছিল, আল্লাহদিকে পাঠানো হবে না। আল্লাহদিকে কোথাও পাঠানোর কথা তারা ভাবতেও পারে না। বিশেষ করে ওই খুনেদের কাছে কখনো মেয়ে তারা পাঠাতে পারে, যাবার কথা ভাবলেই মেয়ে যখন আতঙ্কে পাঁশুটে মেরে যায়?

সারসংক্ষেপ

দারিদ্র্যের কারণে মাসি-পিসি গাঁয়ের শাকসবজি ও ফলমূল শহরের বাজারে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ শুরু করে। আগে তাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ থাকলেও অহুদার দায়িত্ব তাদের এক করে দেয়। তারা অহুদার নিজের সন্তানের মতো ভালোবাসে এবং তার ভরণপোষণ ও নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করে। অহুদার শ্বশুরবাড়িতে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবলেই সে ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তাই মাসি-পিসি সিদ্ধান্ত নেয়, কোনো অবস্থাতেই তারা অহুদারকে সেই বাড়িতে পাঠাবে না।

থ

২০. অহুদারকে নিয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে মাসি-পিসির প্রতিরোধ

মূলগল্প থেকে

বাইরে থেকে হাঁক আসে কানাই চৌকিদারের। মাসি-পিসি পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়, জোরে নিঃশ্বাস পড়ে দুজনের। সারাটা দিন গেছে লড়ে আর লড়ে। সরকারবাবুর সঙ্গে বাজারের তোলা নিয়ে ঝগড়া করতে অর্ধেক জীবন বেরিয়ে গেছে দু-জনের। এখন এল চৌকিদার কানাই। হাঙ্গামা না আসে রাত্রে, গাঁয়ে লোক যখন ঘুমোচ্ছে।

রসুই চালায় ঝাঁপ এঁটে মাসি-পিসি বাইরে যায়। গুরুপক্ষের একাদশীর উপোস করেছে তারা দুজনে গতকাল আজ দ্বাদশী, জ্যোৎস্না বেশ উজ্জ্বল। কানাইয়ের সাথে গোকুলের যে তিনজন পেয়াদা এসেছে তাদের মাসি-পিসি চিনতে পারে, মাথায় লাল পাগড়ি-আঁটা লোকটা তাদের অচেনা। কানাই বলে, ‘কাছারিবাড়ি যেতে হবে একবার।’

মাসি বলে, ‘এত রাতে?’

পিসি বলে, ‘মরণ নেই?’

কানাই বলে, ‘দারোগাবাবু এসে বসে আছেন বাবুর সাথে। যেতে একবার হবেগো দিদিঠাকরুনরা। বেঁধে নিয়ে যাবার হুকুম আছে।’

মাসি-পিসি মুখে মুখে তাকায়। পথের পাশে ডোবার ধারে কাঁঠাল গাছের ছায়ায় তিন-চারজন ঘুপটি মেরে আছে স্পষ্টই দেখতে পেয়েছে মাসি-পিসি। ওরা যে গাঁয়ের গুন্ডা সাধু বৈদ্য ওসমানেরা তাতে সন্দেহ নেই, বৈদ্যের ফেটি-বাঁধা বাবরি চুলওয়ালা মাথাটায় পাতার ফাঁকে জ্যোৎস্না পড়েছে। তারা যাবে কাছারিতে কানাই আর পেয়াদা কনস্টেবলের সঙ্গে। ওরা এসে অহুদারকে নিয়ে যাবে। মাসি বলে, ‘মোদের একজন গেলে হবে না কানাই?’

পিসি বলে, ‘আমি যাই চলো?’

কর্তা ডেকেছেন দুজনকে।

মাসি-পিসি দুজনেই আবার তাকায় মুখে মুখে।

মাসি বলে, ‘কাপড়টা ছেড়ে আসি কানাই।’ পিসি বলে, ‘হাত ধুয়ে আসি, একদণ্ড লাগবে না।’

তাড়াতাড়িই ফিরে আসে তারা। মাসি নিয়ে আসে বাঁটিটা হাতে করে, পিসির হাতে দেখা যায় রামদার মতো মস্ত একটা কাটারি।

মাসি বলে, ‘কানাই, কত্তাকে বোলো, মেয়েনোকের এত রাতে কাছারিবাড়ি যেতে নজ্জা করে। কাল সকালে যাব।’

পিসি বলে, ‘এত রাতে মেয়েনোককে কাছারিবাড়ি ডাকতে কত্তার নজ্জা করে না কানাই? কানাই ফুঁসে ওঠে, ‘না যদি যাও ঠাকরুনরা ভালোয় ভালোয়, ধরে বেঁধে টেনেইঁচড়ে নিয়ে যাবার হুকুম আছে কিন্তু বলে রাখলাম।’

মাসি বাঁটিটা বাগিয়ে ধরে দাঁতে দাঁত কামড়ে বলে, ‘বটে? ধরে বেঁধে টেনেহঁচড়ে নিয়ে যাবে? এসো। কে এগিয়ে আসবে এসো। বাঁটির এক কোপে গলা ফাঁক করে দেব।’ পিসি বলে, ‘আয় না বজ্জাত হারামজাদারা, এগিয়ে আয় না? কাটারির কোপে গলা কাটি দু-একটার।’

দু-পা এগোয় তারা দ্বিধাভরে। মাসি-পিসির মধ্যে ভয়ের লেশটুকু না দেখে সত্যিই তারা খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছে। মারাত্মক ভঙ্গিতে বাঁটি আর দা উঁচু হয় মাসি-পিসির।

মাসি বলে, ‘শোনো কানাই, এ কিন্তু একি নয় মোটে। তোমাদের সাথে মোরা মেয়েনোক পারব না জানি কিন্তু দুটো-একটাকে মারব জখম করব ঠিক।’

পিসি বলে, ‘মোরা নয় মরব।’

তারপর বিনা পরামর্শেই মাসি-পিসি হঠাৎ গলা ছেড়ে দেয়। প্রথমে শুরু করে মাসি, তারপর যোগ দেয় পিসি।

আশপাশে যত বাসিন্দা আছে সকলের নাম ধরে গলা ফাটিয়ে তারা হাঁক দেয়, ও বাবাঠাকুর! ও ঘোষ মশায়!

ও জনাঙ্গন! ওগো কানুর মা! বিপিন! বংশী

কানাই অদৃশ্য হয়ে যায় দলবল নিয়ে। হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি শুরু হয়ে যায় পাড়ায়, অনেকে ছুটে আসে, কেউ কেউ ব্যাপার অনুমান করে ঘরের জানালা দিয়ে উঁকি দেয় বাইরে না বেরিয়ে

সারসংক্ষেপ

রাতে কানাই চৌকিদার দারোগার নির্দেশে মাসি-পিসিকে কাছারিবাড়িতে ডেকে নিয়ে যেতে আসে। তাদের আশঙ্কা হয়, গোকুলের লোকজন অহ্লাদিকে জোর করে নিয়ে যেতে চায়। মাসি-পিসি কৌশলে ঘরে গিয়ে বাঁটি ও কাটারি নিয়ে ফিরে আসে এবং স্পষ্ট জানিয়ে দেয় যে তারা অহ্লাদিকে নিয়ে যেতে দেবে না। তাদের দৃঢ়তা দেখে আগত লোকজন ভয় পেয়ে যায়। পরে মাসি-পিসি পাড়ার লোকজনকে জোরে জোরে ডাকতে শুরু করলে অনেক মানুষ ছুটে আসে। ফলে কানাই ও তার দলবল সরে যেতে বাধ্য হয়। এ ঘটনায় মাসি-পিসির সাহস, দৃঢ়তা ও অহ্লাদিকে রক্ষার সংকল্প আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

২১. কপিলদাস মূর্মুর শেষ কাজ – শওকত আলী

মূলপাঠ

শীতের টাঙনের পানি এখন অনেক নিচে। ধীর স্রোতের পাশে বসে কপিলদাস রোদ পোহায়। চারপাশের নানা শব্দ তার কানে গেলেও সে নির্বিকার। তার মনে হয়, জীবনের সবকিছুই পরস্পরের সঙ্গে মিশে আছে—জন্ম-মরণ, হাসি-কান্না, রাগ-ক্ষোভ-সবই এক শান্ত স্রোতে মিলে যায়।

মাঝে মাঝে পুরোনো দিনের স্মৃতি তার মনে জেগে ওঠে। পুশনা পরবের নাচ, যৌবনের শিকার, মহাজনের ধান কিসানদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া, মানুষের পাদ্রিকে টাঙনের পানিতে ফেলে দেওয়া—কত ঘটনা মনে পড়ে তার। নিজের শিকারি কুকুরটির কথাও মনে পড়ে, যেটিকে পরে বাঘে খেয়ে ফেলেছিল।

কপিলদাস নিজের মনে নানা গল্প ফাঁদে। মনে পড়ে সাঁওতালদের বসতি নিয়ে মহাজন ও আধিয়ারদের বিরোধের কথা। তখন কেউ বলেছিল, “হামরা মহাজনের সঙ্গে নাই, আধিয়ার কিসানের সঙ্গে হামরা।” কিন্তু সেই ঘটনার শেষটা আর তার মনে পড়ে না।

বেলা ফুরিয়ে এলে কপিলদাস বাড়ি ফেরে। পথে সলিমউদ্দিন তাকে জানায়, তাদের বসতি আর থাকবে না; সেখানে ধানের আবাদ হবে এবং ট্রাক্টর চলবে। কপিলদাস অবাক হয়। তার মনে প্রশ্ন জাগে—ট্রাক্টর তো মাঠে চলে, মানুষের বসতির ওপর দিয়ে কেন চলবে?

বাড়িতে নাতিরা তাকে বাঘের গল্প বলতে বলে। কপিলদাস যৌবনের শিকারের কথা বলতে শুরু করে। একসময় সে একটি বাঘকে তির মেরেছিল। গল্প বলতে বলতে সে যেন আবার নিজের কৈশোরে ফিরে যায়।

সারসংক্ষেপ

শওকত আলীর ‘কপিলদাস মুরুর শেষ কাজ’ গল্পের এই অংশে বৃদ্ধ কপিলদাসের স্মৃতিচারণ ও পরিবর্তিত সময়ের সংকট ফুটে উঠেছে। টাঙনের ধারে বসে সে জীবনের নানা ঘটনা স্মরণ করে। এদিকে সাঁওতালদের পুরোনো বসতি উচ্ছেদ করে সেখানে কৃষিকাজ ও ট্রাক্টর চালানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। খবরটি কপিলদাসের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়। নাতিদের বাঘের গল্প বলতে গিয়ে তার হারানো যৌবন ও শিকারি-সত্তা আবার জেগে ওঠে। এখানে স্মৃতি, বার্ষিক্য, ভূমি হারানোর আশঙ্কা ও আদিবাসী জীবনের সংকট প্রধান হয়ে উঠেছে।

২২. কপিলদাস মুরুর শেষ কাজ – শওকত আলী

মূলপাঠ

কপিলদাসের মনে হতে থাকে, তাদের বসতি উঠে যাওয়ার ঘটনা আকস্মিক নয়। বহু পুরোনো ভিটেমাটি একদিন ট্রাক্টরের চাকার নিচে চলে যাবে—এ কথা সে মনে নিতে পারে না। কিন্তু নিজের কাছেই শুনতে থাকে, “তুই বুঢ়া মানুষ হে মড়ল, তোর কিছু করার নাই।”

বাড়ির উঠোনে মহিন্দর, দীনদাসসহ কয়েকজন বসতি নিয়ে আলোচনা করতে থাকে। কপিলদাসও কাছে যায়। কিন্তু মহিন্দর তাকে বলে, “তুই এখন যা তো বাবা, বুঢ়া মানুষ তুই ইসবের কী বুঝিস!” কপিলদাস চুপ করে সরে আসে। সে অনুভব করে, সত্যিই যেন তার কিছু করার নেই।

এদিকে নাতিরা আবার তার কাছে বাঘের গল্প শুনতে চায়। কপিলদাস গল্প বলতে বলতে ধনুক হাতে নেয়। কাঁপা হাতে সে ধনুকে ছিলা পরায়। নাতিরা তাকে ঘিরে দাঁড়ায়। সে তির লাগিয়ে অন্ধকারের দিকে নিশানা করে। নাতিরা নিষেধ করলেও কপিলদাস প্রথম তির ছুড়ে দেয়। এরপর দ্বিতীয় তিরও ছোড়ে। লোকজন তাকে থামাতে চায়। কিন্তু সে তখন আর বৃদ্ধ অসহায় মানুষটি নয়; তার মধ্যে যেন কৈশোরের শিকারি কপিলদাস ফিরে এসেছে। তির-ধনুক হাতে সে অন্ধকারের দিকে এগিয়ে যায়।

সারসংক্ষেপ

এই অংশে কপিলদাসের বার্ষিক্য ও অসহায়ত্বের বিপরীতে তার অন্তর্গত সাহস ও যৌবনের সত্তা প্রকাশ পেয়েছে। বসতি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে সরাসরি কিছু করতে না পারায় সে নিজেকে অক্ষম মনে করে। কিন্তু নাতিদের সঙ্গে থাকতে থাকতে তার পুরোনো শিকারি-সত্তা জেগে ওঠে। ধনুক-তির হাতে নিয়ে সে একের পর এক তির ছোড়ে এবং অন্ধকারের দিকে এগিয়ে যায়। তার এই আচরণে হারিয়ে যেতে বসা আত্মপরিচয়, ভূমির প্রতি টান এবং প্রতিবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে।

২৩. ‘রেইনকোট’ – আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

মূলপাঠ

ভোররাত থেকে বৃষ্টি। এমন চমৎকার বাদলার সকালে দরজায় প্রবল কড়া নাড়া। মিলিটারি ভেবে ভয় পায় নুরুল হুদা। দরজা খুলতেই প্রিন্সিপ্যালের পিওন ইসহাক এসে জানায়, কলেজে বোমা বিস্ফোরণ ঘটেছে এবং প্রিন্সিপ্যাল তাকে এখনই যেতে বলেছেন।

বউয়ের কথায় নুরুল হুদা শালা মিন্টুর রেইনকোটটি পরে বের হয়। মিন্টু বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। মিলিটারির ভয়ে নুরুল হুদা বারবার বাড়ি বদলেছে।

রেইনকোট পরে রাস্তায় বেরিয়ে তার মনে হয়, বৃষ্টির পানি তার গায়ে লাগছে না। বাসে ওঠার পর রেইনকোট দেখে কয়েকজন যাত্রী ভয়ে নেমে যায়।

আসাদ গেটের কাছে মিলিটারি বাস থামিয়ে যাত্রীদের তল্লাশি করে। একজন মিলিটারি বাসে উঠে নুরুল হুদার দিকে তাকিয়ে শেষে বলে, ‘আগে বাড়ো’। সে কলেজে পৌঁছে প্রিন্সিপালের কামরায় যায়।

প্রিন্সিপালের কামরায় এক জাঁদরেল মিলিটারি অফিসার বসে ছিল। নুরুল হুদা ও আবদুস সাত্তার মৃধাকে মিলিটারি জিপে তুলে অচেনা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়।

মিলিটারি নুরুল হুদাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। কলেজে লোহার আলমারি নিয়ে আসা কুলিদের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল বলে অভিযোগ করা হয়। মিলিটারি জানায়, কুলিরা আসলে ছদ্মবেশী মিসক্রিয়েন্ট।

মিসক্রিয়েন্টদের ঠিকানা জানতে চাইলেও নুরুল হুদা কোনো ঠিকানা দেয় না। তাকে নির্যাতন করা হয়। তবু সে জানায়, মিসক্রিয়েন্টদের ঠিকানা তার জানা আছে।

সারসংক্ষেপ

নুরুল হুদা শালার রেইনকোট পরে কলেজে যাওয়ার পথে মিলিটারির তল্লাশির মুখে পড়ে। কলেজে পৌঁছানোর পর তাকে ও আবদুস সাত্তার মৃধাকে ধরে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মিলিটারি তাকে ছদ্মবেশী মিসক্রিয়েন্টদের সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের ঠিকানা জানতে চাইলেও নুরুল হুদা কোনো তথ্য প্রকাশ করে না। তাকে নির্যাতন করা হলেও সে মিসক্রিয়েন্টদের ঠিকানা জানে বলে জানায়।

২৪. ‘রেইনকোট’ – আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

মূলপাঠ

বউয়ের কথায় নুরুল হুদা শালা মিন্টুর রেইনকোটটি পরে কলেজের উদ্দেশে বের হয়। মিন্টু বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। মিলিটারির ভয়ে নুরুল হুদা নিজেকে সব সময় নিরাপদ রাখার চেষ্টা করে।

রেইনকোট পরে রাস্তায় বেরিয়ে সে বৃষ্টির হাত থেকে স্বস্তি পায়। বাসে ওঠার পর কয়েকজন যাত্রী তাকে দেখে ভয়ে নেমে যায়।

আসাদ গেটের কাছে মিলিটারি বাস থামিয়ে তল্লাশি চালায়। একজন মিলিটারি নুরুল হুদার দিকে তাকিয়ে তাকে যেতে দেয়। কলেজে পৌঁছে সে প্রিন্সিপালের কামরায় যায়।

সেখানে এক জাঁদরেল মিলিটারি অফিসার তাকে ও আবদুস সাত্তার মৃধাকে জিপে তুলে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়।

নুরুল হুদাকে কলেজে আসা কুলিদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। তাকে জানানো হয়, তারা আসলে ছদ্মবেশী মিসক্রিয়েন্ট এবং নুরুল হুদার নাম তারা বলেছে।

মিসক্রিয়েন্টদের ঠিকানা জানতে চেয়ে তাকে চাপ দেওয়া হয়। নুরুল হুদা কোনো ঠিকানা প্রকাশ করে না। তাকে নির্যাতন করা হলেও সে নিজের কথা থেকে সরে যায় না।

সারসংক্ষেপ

নুরুল হুদা মিন্টুর রেইনকোট পরে কলেজে যায়। পথে মিলিটারি বাস তল্লাশি করলেও তাকে যেতে দেয়। কলেজে পৌঁছানোর পর তাকে ও আবদুস সাত্তার মৃধাকে ধরে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাকে ছদ্মবেশী মিসক্রিয়েন্টদের সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। মিসক্রিয়েন্টদের ঠিকানা জানতে চাইলেও নুরুল হুদা কোনো তথ্য প্রকাশ করে না। নির্যাতন করেও তার কাছ থেকে কোনো ঠিকানা আদায় করা যায় না।

২৫. নেকলেস – গী দ্য মোপাসাঁ

মূলপাঠ

মাতিলদা লোইসেল ছিল সুন্দরী, কিন্তু সাধারণ কেরানির স্ত্রী হওয়ায় সে নিজের জীবন নিয়ে অসুখী ছিল। বিলাসবহুল জীবন, দামি পোশাক ও গহনার প্রতি তার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। একদিন স্বামীর মাধ্যমে একটি সরকারি অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ পেয়ে সে আনন্দিত হওয়ার বদলে পোশাক ও গহনার অভাবের কথা ভেবে কাঁদতে থাকে। স্বামী চারশ ফাঁ দিয়ে তাকে পোশাক কিনে দেয়। পরে ধনী বান্ধবী মাদাম ফোরসটিয়ারের কাছ থেকে সে একটি হীরার হার ধার নেয়।

অনুষ্ঠানে মাতিলদা অত্যন্ত সুন্দরভাবে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গভীর রাতে বাড়ি ফিরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে বুঝতে পারে, গলার হারটি নেই। অনেক খোঁজ করেও হারটি পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত একই রকম একটি হার কিনে বান্ধবীকে ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় তারা। এর জন্য বিপুল ঋণ করতে হয়। ঋণ শোধ করতে মাতিলদা ও তার স্বামী দশ বছর কঠোর পরিশ্রম করে।

দশ বছর পর মাতিলদা একদিন মাদাম ফোরসটিয়ারের সঙ্গে দেখা করে সব ঘটনা জানায়। তখন ফোরসটিয়ার তাকে জানায়, ধার দেওয়া হারটি আসলে নকল ছিল; তার মূল্য ছিল মাত্র পাঁচশ ফাঁর মতো।

সারসংক্ষেপ

মাতিলদার বিলাসী জীবনের আকাঙ্ক্ষা তাকে ধার করা হার হারানোর পর দীর্ঘদিনের দারিদ্র্য ও পরিশ্রমের মধ্যে ফেলে দেয়। অথচ হারটি ছিল নকল। ঘটনাটি মানুষের অহংকার, অভিজাত্যের মোহ এবং সত্য গোপন করার পরিণতি তুলে ধরে।

২৭. সারসংক্ষেপ

মূলপাঠ থেকে নির্বাচিত বাক্য:

সে ছিল চমৎকার এক সুন্দরী তরুণী। নিয়তির ভুলেই যেন এক কেরানির পরিবারে তার জন্ম হয়েছে। তার ছিল না কোনো আনন্দ, কোনো আশা। পরিচিত হবার, প্রশংসা পাওয়ার, প্রেমলাভ করার এবং কোনো ধনী অথবা বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে বিবাহিত হওয়ার কোনো উপায় তার ছিল না। সর্বদা তার মনে দুঃখ। তার ধারণা, যত সব সুরুচিপূর্ণ ও বিলাসিতার বস্তু আছে, সেগুলির জন্যই তার জন্ম হয়েছে। তার বাসকক্ষের দারিদ্র্য, হতশ্রী দেওয়াল, জীর্ণ চেয়ার এবং বিবর্ণ জিনিসপত্রের জন্য সে ব্যথিত হতো। সে কামনা করে একটি বৈঠকখানা, পুরানো রেশমি পর্দা সেখানে ঝুলবে। থাকবে তাতে বিভিন্ন চমৎকার আসবাব, যার ওপর শোভা পাবে অমূল্য সব প্রাচীন কৌতূহল-উদ্দীপক সামগ্রী। তার কাছে ফ্রক বা জড়োয়া গহনা নেই-নেই বলতে কিছু নেই। অথচ ঐ সব বস্তুই তার প্রিয়। তার ধারণা ঐসবের জন্যই তার সৃষ্টি।

সারসংক্ষেপ:

মাতিলদা সৌন্দর্যের অধিকারী হলেও সাধারণ কেরানি পরিবারে জন্ম নেওয়ায় নিজের জীবন নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিল। বিলাসবহুল ঘর, দামি পোশাক, গহনা ও অভিজাত সমাজে পরিচিত হওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা তার মনে সব সময় অশান্তি সৃষ্টি করত। নিজের সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতা মেনে নেওয়ার পরিবর্তে সে কল্পনার বিলাসী জগতে বাস করত। ফলে তার সৌন্দর্য ও স্বাভাবিক সুখের চেয়ে অভাববোধ এবং সামাজিক মর্যাদার আকাঙ্ক্ষাই তার জীবনের প্রধান হয়ে ওঠে।

২৭. সারসংক্ষেপ

মূলপাঠ থেকে নির্বাচিত বাক্য:

এক সন্ধ্যায় হাতে একটি বড় খাম নিয়ে বেশ উল্লসিত হয়ে তার স্বামী ঘরে ফিরল। সে বলল, ‘এই যে, তোমার জন্য এক জিনিস এনেছি।’ মেয়েটি তাড়াতাড়ি খামটি ছিঁড়ে তার ভিতর থেকে একখানা ছাপানো কার্ড বের করল। ‘জনশিক্ষা মন্ত্রী ও মাদাম জর্জ রেমপন্ন আগামী ১৮ই জানুয়ারি সন্ধ্যায় তাঁহাদের নিজ বাসগৃহে মসিয়ে ও মাদাম লোইসেলের উপস্থিতি কামনা করেন।’ তার স্বামী যেমন আশা করেছিল তেমনভাবে খুশি হওয়ার পরিবর্তে মেয়েটি বিদ্রোহের ভাব নিয়ে আমন্ত্রণ-লিপিখানা টেবিলের উপর নিক্ষেপ করে, বিড় বিড় করে বলে : ‘ওখানা নিয়ে তুমি আমায় কী করতে বল?’ সে ঐ সম্পর্কে কিছু ভাবেনি। তাই সে বিব্রতভাবে বলে : ‘কেন আমরা থিয়েটারে যাবার সময় তুমি যেই পোশাকটা পর সেটা পরবে। ওটা আমার কাছে খুব সুন্দর লাগে-’

সারসংক্ষেপ:

মাতিলদার স্বামী আনন্দের সঙ্গে মন্ত্রীর বাড়ির অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র এনে স্ত্রীকে খুশি করতে চেয়েছিল। কিন্তু আমন্ত্রণ পেয়ে মাতিলদা আনন্দিত না হয়ে নিজের উপযুক্ত পোশাক না থাকার কথা ভেবে দুঃখিত হয়ে পড়ে। স্বামী তাকে সাভুনা দেওয়ার চেষ্টা করলেও তার অসন্তোষ দূর হয় না। এতে মাতিলদার বিলাসিতা ও সামাজিক মর্যাদার প্রতি গভীর আকাঙ্ক্ষা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কবিতাংশের সারসংক্ষেপ

ঋতু বর্ণন – আলাওল

প্রথমে বসন্ত ঋতু নবীন পল্লব।

দুই পক্ষ আগে পাছে মধ্যে সুমাধব।।

মলয়া সমীর হৈলা কামের পদাতি।

মুকুলিত কৈল তবে বৃক্ষ বনস্পতি।।

কুসুমিত কিংগুক সঘন বন লাল।

পুষ্পিত সুরঙ্গ মল্লি লবঙ্গ গুল্লাল।।

ভ্রমরের ঝঙ্কার কোকিল কলরব।

শুনিতে যুবক মনে জাগে অনুভব।।

নানা পুষ্প মালা গলে বড় হরষিত।

বিচিত্র বসন অঙ্গে চন্দন চর্চিত।।

নিদাঘ সমএ অতি প্রচণ্ড তপন।

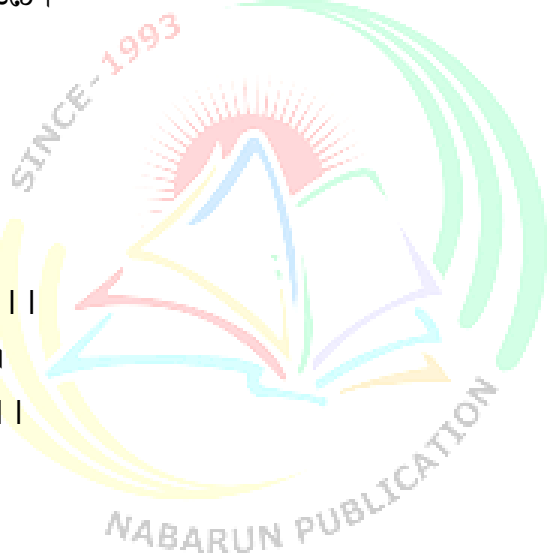
রৌদ্র ত্রাসে রহে ছায়া চরণে সরণ॥

চন্দন চম্পক মাল্য মলয়া পবন।

সতত দম্পতি সঙ্গে ব্যাপিত মদন।।

পাবন সময় ঘন ঘন গরজিত।

নির্ভয়ে বরিষে জল চৌদিকে পূরিত।।



ঘোর শব্দে কৈলাসে মল্লার রাগ গাত্র ।
দাদুরী শিখীনি রব অতি মন ভাএ ॥
কীটকুল রব পুনি ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে ।
শুনিতে যুবক চিত্ত হরষিত ডরে ।
আইল শারদ ঋতু নির্মল আকাশে ।
দোলাএ চামর কেশ কুসুম বিকাশে ।
নবীন খঞ্জন দেখি বড়হি কৌতুক ।
উপজিত যামিনী দম্পতি মনে সুখ ।
প্রবেশে হেমন্ত ঋতু শীত অতি যায় ।
পুষ্প তুল্য তাম্বুল অধিক সুখ হয় ।।
শীতের তরাসে রবি তুরিতে লুকাএ ।
অতি দীর্ঘ সুখ নিশি পলকে পোহাএ ॥
পুষ্প শয্যা ভেদ ভুলি বিচিত্র বসন ।
উরে উরে এক হৈলে শীত নিবারণ ।।
কাফুর কস্তুরী চুয়া যাবক সৌরভ ।
দম্পতির চিত্তে চৈতন অনুভব ।।

সারসংক্ষেপ

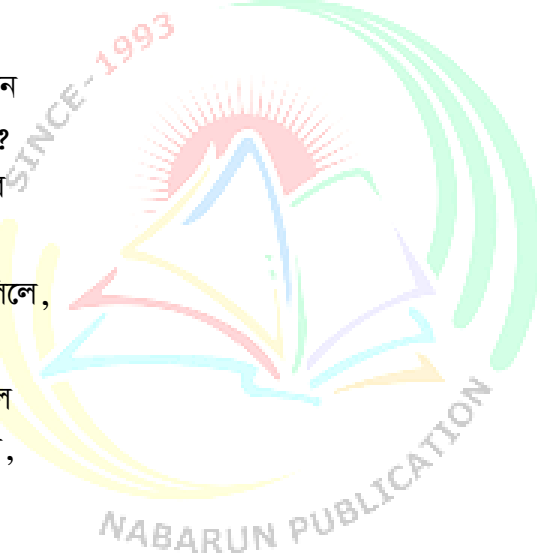
আলাওল 'ঋতু বর্ণন' কবিতায় ধারাবাহিকভাবে ঋতুর পরিবর্তনের সঙ্গে প্রকৃতি ও মানুষের জীবনের পরিবর্তন তুলে ধরেছেন। প্রথমে বসন্ত এসে নবপল্লব, ফুল, মলয়বায়ু, ভ্রমরের গুঞ্জন ও কোকিলের কলতানে প্রকৃতিকে অপরূপ করে তোলে এবং মানুষের মনে আনন্দ ও প্রেমের অনুভূতি জাগায়। এরপর গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপের পর বর্ষা নামে; মেঘের গর্জন, প্রবল বৃষ্টি ও নানা প্রাণীর শব্দে প্রকৃতি মুখর হয়ে ওঠে। শরতে নির্মল আকাশ ও প্রস্ফুটিত ফুলে প্রকৃতি স্নিগ্ধ রূপ ধারণ করে। সবশেষে হেমন্তের শীতল আবহাওয়ায় দীর্ঘ রাত ও উষ্ণতার আকাজক্ষা দম্পতিদের মনে নতুন অনুভূতির সৃষ্টি করে। এভাবে কবি ঋতুর বৈচিত্র্যময় রূপের সঙ্গে প্রকৃতি, প্রাণী ও মানুষের আনন্দ-অনুভূতির নিবিড় সম্পর্ক তুলে ধরেছেন।

২. বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ – মাইকেল মধুসূদন দত্ত

“এতক্ষণে”- অরিন্দম কহিলা বিষাদে-

“জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল
রক্ষঃপুরে! হায়, তাত, উচিত কি তব
এ কাজ, নিকষা সতী তোমার জননী,
সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ? শূলিশঙ্খনিভ
কুস্কর্গ? ভ্রাতৃপুত্র বাসববিজয়ী!
নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তঙ্করে?
চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?

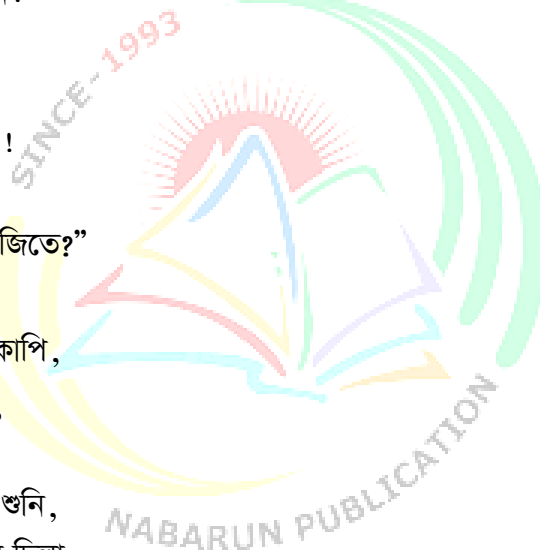
কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরু জন তুমি
পিতৃতুল্য। ছাড় দ্বার, যাব অজ্ঞাগারে,
পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে,
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে।”
উত্তরিল বিভীষণ, “বৃথা এ সাধনা,
ধীমান্! রাঘবদাস আমি; কী প্রকারে
তঁাহার বিপক্ষ কাজ করিব, রক্ষিতে
অনুরোধ?” উত্তরিল কাতরে রাবণি;-
“হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে!
রাঘবের দাস তুমি? কেমনে ও মুখে
আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা দাসেরে!
স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থানুর ললাটে;
পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি
ধূল্যায়? হে রক্ষেরথি, ভুলিলে কেমনে
কে তুমি? জনম তব কোন মহাকূলে?
কে বা সে অধম রাম? স্বচ্ছ সরোবরে
করে কেলি রাজহংস পঙ্কজ-কাননে;
যায় কি সে কভু, প্ৰভু, পঙ্কিল সলিলে,
শৈবালদলের ধাম? মৃগেন্দ্র কেশরী,
কবে, হে বীরকেশরী, সম্ভাষে শৃগালে
মিত্রভাবে? অজ্ঞ দাস, বিজ্ঞতম তুমি,
অবিদিত নহে কিছু তোমার চরণে।
ক্ষুদ্রমতি নর, শূর, লক্ষ্মণ; নহিলে
অস্ত্রহীন যোধে কি সে সম্মোদে সংগ্রামে?
কহ, মহারথী, এ কি মহারথীপ্রথা?
নাহি শিশু লঙ্কাপুরে, শুনি না হাসিবে
এ কথা! ছাড়হ পথ; আসিব ফিরিয়া
এখনি! দেখিব আজি, কোন্ দেববলে,
বিমুখে সমরে মোরে সৌমিত্রি কুমতি!
দেব-দৈত্য-নর-রণে, স্বচক্ষে দেখেছ,
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, পরাক্রম দাসের! কী দেখি
ডরিবে এ দাস হেন দুর্বল মানবে?
নিকুণ্ডিলা যজ্ঞাগারে প্রগভে পশিল
দস্তী; আজ্ঞা কর দাসে, শান্তি নরাধমে।



তব জন্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে
বনবাসী! হে বিধাতঃ, নন্দন-কাননে
ভ্রমে দুরাচার দৈত্য? প্ৰফুল্ল কমলে
কীটবাস? কহ তাত, সহিব কেমনে
হেন অপমান আমি,- ভ্রাতৃ-পুত্র তব?
তুমিও, হে রক্ষোমণি, সহিছ কেমনে?”
মহামন্ত্র-বলে যথা নম্রশিরঃ ফণী,
মলিনবদন লাজে, উত্তরিলা রথী
রাবণ-অনুজ, লক্ষ্মি রাবণ-আত্মজে;
“নহি দোষী আমি, বৎস; বৃথা ভর্ষস মোরে
তুমি! নিজ কর্ম-দোষে, হায়, মজাইলা
এ কনক-লঙ্কা রাজা, মজিলা আপনি!
বিরত সতত পাপে দেবকুল; এবে
পাপপূর্ণ লঙ্কাপুরী; প্রলয়ে যেমতি
বসুধা, ডুবিছে লঙ্কা এ কালসলিলে!
রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী
তেঁই আমি। পরদোষে কে চাহে মজিতে?”
রুমিলা বাসবদ্রাস। গম্ভীরে যেমতি
নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে জীমূতেন্দ্র কোপি,
কহিলা বীরেন্দ্র বলী,-“ধর্মপথগামী,
হে রাক্ষসরাজানুজ, বিখ্যাত জগতে
তুমি; কোন্ ধর্ম মতে, কহ দাসে, গুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি,-এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি? শাস্ত্রে বলে, গুণবান্ যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা!
এ শিক্ষা, হে রক্ষোবর, কোথায় শিখিলে?
কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোমা! হেন সহবাসে,
হে পিতৃব্য, বর্বরতা কেন না শিখিবে?
গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্মতি।”

সারসংক্ষেপ:

মেঘনাদ যুদ্ধে লক্ষ্মণের প্রবেশের কথা জেনে পিতৃব্য বিভীষণের কাছে গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করে। সে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে, রাবণের ভাই ও লঙ্কার রাজপরিবারের সদস্য হয়েও বিভীষণ কীভাবে শত্রুপক্ষের আশ্রয় নিয়েছেন এবং



স্বজনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। বিভীষণ নিজের সিদ্ধান্তকে ধর্ম ও ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান হিসেবে ব্যাখ্যা করে জানান যে রাবণের পাপের কারণে লক্ষ্মী ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ----- মেঘনাদ বিভীষণের যুক্তি মেনে নিতে পারে না; সে বীরত্ব, স্বজনপ্রীতি ও রাজধর্মের কথা তুলে ধরে রাম ও লক্ষ্মণকে তুচ্ছ করে। ----- শেষ পর্যন্ত সে বিভীষণকে স্বজন ও জাতির প্রতি কর্তব্য বিসর্জন দেওয়ার জন্য তীব্রভাবে ভৎসনা করে।

৩. সোনার তরী – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।

কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।

রাশি রাশি ভরা ভরা

ধান কাটা হলো সারা,

ভরা নদী ক্ষুরধারা

খরপরশা-

কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা ।।

একখানি ছোটো খেত, আমি একেলা-

চারি দিকে বাঁকা জল করিছে খেলা ॥

পরপারে দেখি আঁকা

তরুছায়ামসী-মাখা

গ্রামখানি মেঘে ঢাকা

প্রভাতবেলা-

এপারেতে ছোটো খেত, আমি একেলা ।।

গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে!

দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে ।

ভরা পালে চলে যায়,

কোনো দিকে নাহি চায়,

চেউগুলি নিরুপায়

ভাঙে দু ধারে-

দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে ।।

ওগো, তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে?

বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে ।

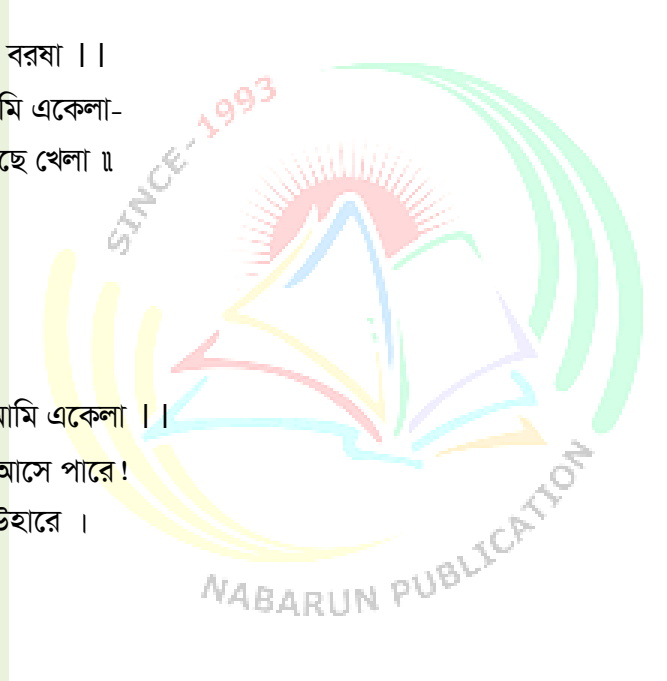
যারে খুশি তারে দাও

যেয়ো যেথা যেতে চাও,

শুধু তুমি নিয়ে যাও

ক্ষণিক হেসে

আমার সোনার ধান কূলেতে এসে ॥



যত চাও তত লও তরঙ্গী-পরে ।
আর আছে- আর নাই, দিয়েছি ভরে ॥
এতকাল নদীকূলে
যাহা লয়ে ছিনু ভুলে
সকলি দিলাম তুলে
থরে বিথরে-

এখন আমারে লহো করুণা করে ।।
ঠাই নাই, ঠাই নাই- ছোটো সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি ।
শ্রাবণগগন ঘিরে
ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,
শূন্য নদীর তীরে
রহিনু পড়ি-
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী ।।

সারসংক্ষেপ

বর্ষার দিনে কবি নদীর তীরে একা বসে থাকা এক কৃষকের চিত্র এঁকেছেন, যার ধান কাটা শেষ হলেও চারদিকে বন্যার জল । ----- এমন সময় গান গেয়ে এক মাঝি সোনার তরী নিয়ে তার কাছে আসে; কবি পরিচিত মনে হওয়া সেই মাঝিকে অনুরোধ করেন তাঁর সমস্ত সোনার ধান তরীতে তুলে নিতে । মাঝি কবির সব ধান নিয়ে নিলেও তরীতে আর জায়গা না থাকায় কবিকে সঙ্গে নিল না । ----- শেষ পর্যন্ত কবি শূন্য নদীর তীরে একা পড়ে রইলেন, আর তাঁর সঞ্চিত সবকিছু নিয়ে ‘সোনার তরী’ চলে গেল । কবিতাটিতে মানুষের সারা জীবনের অর্জন, আত্মত্যাগ এবং শেষপর্যন্ত একাকিত্বের গভীর তাৎপর্য প্রতীকীভাবে প্রকাশ পেয়েছে ।

৪. বিদ্রোহী – কাজী নজরুল ইসলাম

বল বীরু
বল উন্নত মম শির !
শির নেহারি’ আমারি নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির !
বল বীরু
বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি’
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি’
খোদার আসন ‘আরশ’ ছেদিয়া,
ভুলোক দু্যলোক গোলক ভেদিয়া
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ববিধাতর !
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর !
বল বীরু
আমি চির উন্নত শির ! ...

মহা-বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উত্পীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না
বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।
আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বৃকে ঐকে দিই পদ-চিহ্ন,
আমি ষ্ট্রা-সূদন, শোক-তাপ হানা খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন !
আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বৃকে ঐকে দেবো পদ-চিহ্ন !
আমি খেয়ালী-বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন !
আমি চির-বিদ্রোহী বীর
বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির !

সারসংক্ষেপ

কবি ‘বিদ্রোহী’ কবিতায় অন্যায়, অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে এক দুর্দমনীয় বিদ্রোহী সত্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। ...
বিদ্রোহী নিজেকে মহাবিশ্বের সীমা অতিক্রমকারী শক্তিমান বীর হিসেবে ঘোষণা করে এবং তার মাথা সর্বদা উন্নত রাখার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে। সে দেবতা, বিধাতা ও প্রচলিত নিয়তির বিরুদ্ধেও বিদ্রোহের সাহস দেখায়। -...তবে
এই বিদ্রোহ ধ্বংসের জন্য নয়; অত্যাচারিত মানুষের মুক্তিই তার চূড়ান্ত লক্ষ্য। যেদিন পৃথিবী থেকে অত্যাচারীর
অত্যাচার এবং নিপীড়িতের কান্না চিরতরে দূর হবে, সেদিনই তার বিদ্রোহের অবসান ঘটবে।

৫. সুচেতনা – জীবনানন্দ দাশ
সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দীপ
বিকেলের নক্ষত্রের কাছে;
সেইখানে দারুচিনি-বনানীর ফাঁকে
নির্জনতা আছে।

এই পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা

সত্য; তবু শেষ সত্য নয়।

কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে;

তবুও তোমার কাছে আমার হৃদয়।

আজকে অনেক রুঢ় রৌদ্রে ঘুরে প্রাণ

পৃথিবীর মানুষকে মানুষের মতো

ভালোবাসা দিতে গিয়ে তবু

দেখেছি আমারি হাতে হয়তো নিহত

ভাই বোন বন্ধু পরিজন প’ড়ে আছে;

পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন;

মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীরই কাছে।

কেবলি জাহাজ এসে আমাদের বন্দরের রোদে
দেখেছি ফসল নিয়ে উপনীত হয়;
সেই শস্য অগণন মানুষের শব;
শব থেকে উৎসারিত স্বর্ণের বিন্ময়
আমাদের পিতা বুদ্ধ কনফুশিয়সের মতো আমাদেরো প্রাণ
মুক ক'রে রাখে; তবু চারিদিকে রক্তক্লান্ত কাজের আহ্বান।
সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বলে- এ-পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে;
সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ;
এ-বাতাস কি পরম সূর্যকরোজ্জ্বল;
প্রায় তত দূর ভালো মানব-সমাজ
আমাদের মতো ক্লান্ত ক্লান্তিহীন নাবিকের হাতে
গ'ড়ে দেবো, আজ নয়, ঢের দূর অন্তিম প্রভাতে।
মাটি-পৃথিবীর টানে মানবজন্মের ঘরে কখন এসেছি,
না এলেই ভালো হ'তো অনুভব ক'রে;
এসে যে গভীরতর লাভ হ'লো সে-সব বুঝেছি
শিশির শরীর ছুঁয়ে সমুজ্জ্বল ভোরে;
দেখেছি যা হ'লো হবে মানুষের যা হবার নয়-
শাস্ত্রত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়।

সারসংক্ষেপ

কবি 'সুচেতনা' কবিতায় যুদ্ধ, রক্তপাত, হিংসা ও মানুষের গভীর সংকটের মধ্যেও একটি সুন্দর ও মানবিক পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছেন। পৃথিবীর বর্তমান বাস্তবতা যতই নির্মম হোক, কবির কাছে তা চূড়ান্ত সত্য নয়; তিনি ভবিষ্যতের আলোকময় মানবসমাজের প্রত্যাশা করেন। মানুষের লোভ ও স্বার্থপরতার কারণে অগণিত প্রাণের মৃত্যু এবং সম্পদের সৃষ্টির বেদনাদায়ক চিত্র কবিকে বিচলিত করে। তবু মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও পৃথিবীর প্রতি দায়বদ্ধতার পথেই তিনি মুক্তির সন্ধান করেন। দীর্ঘ সাধনা ও মনীষার মাধ্যমে একদিন পৃথিবীতে শান্তি, মানবতা ও অনন্ত আলোর সূর্যোদয় ঘটবে-এই আশাবাদই কবিতাটির মূলকথা।

৬. প্রতিদান – জসীমউদ্দীন

আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যে বা আমি বাঁধি তার ঘর,
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।
যে মোরে করিল পথের বিবাগী;
পথে পথে আমি ফিরি তার লাগি;
দীঘল রজনী তার তরে জাগি ঘুম যে হরেছে মোর;
আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যে বা আমি বাঁধি তার ঘর।
আমার এ কূল ভাঙিয়াছে যে বা আমি তার কূল বাঁধি;
যে গেছে বুকেতে আঘাত হানিয়া তার লাগি আমি কাঁদি;

যে মোরে দিয়েছে বিষে ভরা বাণ,
আমি দেই তারে বুকভরা গান;
কাঁটা পেয়ে তারে ফুল করি দান সারাটি জনম ভর,-
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।
মোর বুকে যে বা কবর বেঁধেছে আমি তার বুক ভরি
রঙিন ফুলের সোহাগ-জড়ানো ফুল-মালাধর ধরি
যে মুখে সে কহে নিষ্ঠুরিয়া বাণী
আমি লয়ে সখি, তারি মুখখানি,
কত ঠাই হতে কত কী যে আনি, সাজাই নিরন্তর
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।

সারসংক্ষেপ

‘প্রতিদান’ কবিতায় জসীমউদ্দীন মানুষের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, ক্ষমা ও মমত্ববোধের এক অনন্য দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। যে ব্যক্তি কবির ঘর ভেঙেছে, কূল নষ্ট করেছে এবং তাঁকে আপনজন থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে, কবি প্রতিশোধ না নিয়ে তার ঘর ও কূল গড়ে দিতে চান। যে তাঁকে বিষের মতো কষ্ট দিয়েছে, কবি তার পরিবর্তে ভালোবাসার গান উপহার দেন এবং কাঁটার বদলে ফুল দিয়ে সাজিয়ে দেন তার জীবন। যে ব্যক্তি তাঁর বুকে বেদনার সৃষ্টি করেছে, তার প্রতিও কবি ভালোবাসা ও সৌন্দর্যের উপহার দিতে চান। এভাবে কবি শত্রুতার পরিবর্তে ভালোবাসা এবং প্রতিহিংসার পরিবর্তে ক্ষমা ও মানবিকতার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

৭. তাহারেই পড়ে মনে – সুফিয়া কামাল

“হে কবি, নীরব কেন ফাগুন যে এসেছে ধরায়, বসন্তে বরিয়া তুমি লবে না কি তব বন্দনায়?”

কহিল সে স্নিগ্ধ আঁখি তুলি-

“দক্ষিণ দুয়ার গেছে খুলি?

বাতাবি নেবুর ফুল ফুটেছে কি? ফুটেছে কি আমার মুকুল?

দখিনা সমীর তার গন্ধে গন্ধে হয়েছে কি অধীর আকুল?”

“এখনো দেখনি তুমি?” কহিলাম, “কেন কবি আজ

এমন উন্মনা তুমি? কোথা তব নব পুষ্পসাজ?”

কহিল সে সুদূরে চাহিয়া-

“অলখের পাথার বাহিয়া

তরী তার এসেছে কি? বেজেছে কি আগমনী গান? ডেকেছে কি সে আমারে? শুনি নাই, রাখি নি সন্ধান।”

কহিলাম, “ওগো কবি! রচিয়া লহ না আজও গীতি, বসন্ত-বন্দনা তব কণ্ঠে শুনি- এ মোর মিনতি।”

কহিল সে মৃদু মধু-স্বরে-

“নাই হলো, না হোক এবারে-

আমারে গাহিতে গান, বসন্তেরে আনিতে বরিয়া-

রহেনি, সে ভুলেনি তো, এসেছে তা ফাগুনে স্মরিয়া।”

কহিলাম : “ওগো কবি, অভিমান করেছে কি তাই? যদিও এসেছে তবু তুমি তারে করিলে বৃথাই।”

কহিল সে পরম হেলায়-

“বৃথা কেন? ফাগুন বেলায়

ফুল কি ফোটেনি সাথে? পুষ্পারতি লভেনি কি ঋতুর রাজন?

মাধবী কুঁড়ির বুকে গন্ধ নাহি? করে নাই অর্ঘ্য বিরচন?”

“হোক, তবু বসন্তের প্রতি কেন এই তব তীব্র বিমুখতা?”

কহিলাম, “উপেক্ষায় ঋতুরাজে কেন কবি দাও তুমি ব্যথা?”

কহিল সে কাছে সরে আসি

“কুহেলি উত্তরী তলে মাঘের সন্ধ্যাসী-

গিয়াছে চলিয়া ধীরে পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে

রিক্ত হস্তে! তাহারেই পড়ে মনে, ভুলিতে পারি না কোনো মতে ।”

সারসংক্ষেপ

কবিতায় বসন্তের আগমনে চারদিকে ফুল, মুকুল ও দক্ষিণা বাতাসের আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি হলেও কবির মনে কোনো আনন্দ নেই। কথোপকথনে জানা যায়, বসন্তের সৌন্দর্যের পরিবর্তে তাঁর মনে পড়ছে সদ্য বিদায় নেওয়া মাঘের সন্ধ্যাসীর কথা। কুহেলির চাদর জড়িয়ে পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে রিক্ত হাতে চলে যাওয়া মাঘকে তিনি ভুলতে পারেন না। তাই ফাগুন এলেও কবি বসন্ত-বন্দনা করতে অনগ্রহী; তাঁর হৃদয়ে বিদায়ী মাঘের প্রতি গভীর মমতা ও স্মৃতি জেগে আছে। নতুনের আনন্দের মধ্যেও পুরাতনের প্রতি ভালোবাসা ও বিচ্ছেদের বেদনাই কবিতাটির মূল অনুভূতি।

৮. পদ্মা – ফররুখ আহমদ

অনেক ঘূর্ণিতে ঘুরে, পেয়ে চের সমুদ্রের স্বাদ,

জীবনের পথে পথে অভিজ্ঞতা কুড়ায়ে প্রচুর

কেঁপেছে তোমাকে দেখে জলদস্যু- দুরন্ত হার্মাদ

তোমার তরঙ্গভঙ্গে বর্ণ তার হয়েছে পাণ্ডুর।

সংগ্রামী মানুষ তবু দুই তীরে চালায়ে লাঙল

কঠিন শ্রমের ফল শস্য দানা পেয়েছে প্রচুর;

উর্বর তোমার চরে ফলায়েছে পর্যাপ্ত ফসল

জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্ব নিঃসংশয়, নির্ভীক জওয়ান

সবুজের সমারোহে জীবনের পেয়েছে সম্বল।

বর্ষায় তোমার স্রোতে গেছে ভেসে সাজানো বাগান,

অসংখ্য জীবন, আর জীবনের অজস্র সম্ভার,

হে নদী! জেগেছে তবু পরিপূর্ণ আহ্বান,

মৃত জড়তার বুকে খুলেছে মুক্তির স্বর্ণবার

তোমার সুতীব্র গতি। তোমার প্রদীপ্ত স্রোতধারা ॥

সারসংক্ষেপ

ফররুখ আহমদ ‘পদ্মা’ কবিতায় পদ্মা নদীর দুরন্ত গতি, সংগ্রামী রূপ ও মানুষের জীবনে তার বহুমুখী প্রভাবের চিত্র তুলে ধরেছেন। নদীর ঘূর্ণি ও প্রবল স্রোত জলদস্যুদেরও ভীত করেছে, আবার তার উর্বর চর ও দুই তীরের জমিতে পরিশ্রমী মানুষ প্রচুর ফসল ফলিয়ে জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে। বর্ষায় পদ্মার প্রবল স্রোতে বাগান, জীবন ও নানা সম্পদ ভেসে গেলেও তার স্রোত মানুষের মনে নতুন জীবনের আশ্বাস জাগায়। পদ্মার সুতীব্র গতি ও প্রদীপ্ত স্রোতধারা মৃত জড়তার বুক মুক্তির বার্তা বহন করে এবং মানুষকে সংগ্রাম ও জীবনের পথে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করে।

৯. ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ – শামসুর রাহমান

আবার ফুটেছে দ্যাখো কৃষ্ণচূড়া থরে থরে শহরের পথে

কেমন নিবিড় হয়ে। কখনো মিছিলে কখনো-বা

একা হেঁটে যেতে যেতে মনে হয়-ফুল নয়,

ওরা শহিদের বলকিত রক্তের বুদ্ধদ, স্মৃতিগন্ধে ভরপুর।

একুশের কৃষ্ণচূড়া আমাদের চেতনারই রংকে

এ-রঙের বিপরীত আছে অন্য রং,

যে-রং লাগে না ভালো চোখে, যে-রং সন্ত্রাস আনে

প্রাত্যহিকতায় আমাদের মনে সকাল-সন্ধ্যায়-

এখন সে রঙে ছেয়ে গেছে পথ-ঘাট, সারা দেশ

ঘাতকের অশুভ আস্তানা।

আমি আর আমার মতোই বহু লোক

রাত্রি-দিন ভুলুগ্ঠিত ঘাতকের আস্তানায়, কেউ মরা, আধমরা কেউ,

কেউ বা ভীষণ জেদি, দারুণ বিপ্লবে ফেটে পড়া। চতুর্দিকে

মানবিক বাগান, কমলবন হচ্ছে তখনছ

বুঝি তাই উনিশশো উনসত্তরেও

আবার সালাম নামে রাজপথে, শূন্যে তোলে ফ্ল্যাগ,

বরকত বুক পাতে ঘাতকের থাবার সম্মুখে।

সালামের চোখ আজ আলোচিত ঢাকা,

সালামের মুখ আজ তরুণ শ্যামল পূর্ব বাংলা।

দেখলাম রাজপথে, দেখলাম আমরা সবাই

জনসাধারণ

দেখলাম সালামের হাত থেকে নক্ষত্রের মতো মতো *

ঝরে অবিরত অবিদ্যাতীর্ণ বর্ণমালা।

আর বরকত বলে গাঢ় উচ্চারণে

এখনো বীরের রক্তে দুগ্ধিনী মাতার অশ্রুজলে

ফোটে ফুল বাস্তবের বিশাল চত্বরে

হৃদয়ের হরিৎ উপত্যকায়। সেই ফুল আমাদেরই প্রাণ,

শিহরিত ক্ষণে ক্ষণে আনন্দের রৌদ্রে আর দুঃখের ছায়ায়।

সারসংক্ষেপ

‘ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯’ কবিতায় শামসুর রাহমান ভাষাশহিদদের আত্মত্যাগের স্মৃতির সঙ্গে ১৯৬৯-এর গণআন্দোলনের চেতনাকে মিলিয়ে দেখিয়েছেন। কৃষ্ণচূড়ার লাল ফুল কবির চোখে শুধু ফুল নয়, শহিদদের রক্তের প্রতীক এবং একুশের চেতনার রং। স্বৈরাচারী শাসনের সন্ত্রাসে যখন দেশের পথ-ঘাট ও মানুষের জীবন বিপর্যস্ত, তখন সালাম, বরকতসহ সংগ্রামী মানুষেরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে রাজপথে দাঁড়ায়। তাঁদের আত্মত্যাগ ও প্রতিবাদ বাঙালির মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও সাহস জাগিয়ে তোলে। শহিদদের রক্ত ও মায়ের অশ্রু থেকে ফুটে ওঠা সেই ফুলই বাঙালির প্রাণ, চেতনা ও সংগ্রামের অবিনাশী প্রতীক।

১০. আঠারো বছর বয়স – সুকান্ত ভট্টাচার্য

আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ

স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি,

আঠারো বছর বয়সেই অহরহ

বিরট দুঃসাহসেরা দেয় যে উঁকি।

আঠারো বছর বয়সের নেই ভয়

পদাঘাতে চায় ভাঙতে পাথর বাধা,

এ বয়সে কেউ মাথা নোয়াবার নয়-

আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা।

এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য

বাস্পের বেগে স্টিমারের মতো চলে,

প্রাণ দেওয়া-নেওয়া ঝুলিটা থাকে না শূন্য

সঁপে আত্মাকে শপথের কোলাহলে।

আঠারো বছর বয়স ভয়ংকর

তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা,

এ বয়সে প্রাণ তীব্র আর প্রখর

এ বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রণা।

আঠারো বছর বয়স যে দুর্বীর

পথে প্রান্তরে ছোটায় বহু তুফান,

দুর্যোগে হাল ঠিকমতো রাখা ভার

ক্ষত-বিক্ষত হয় সহস্র প্রাণ।

আঠারো বছর বয়সে আঘাত আসে

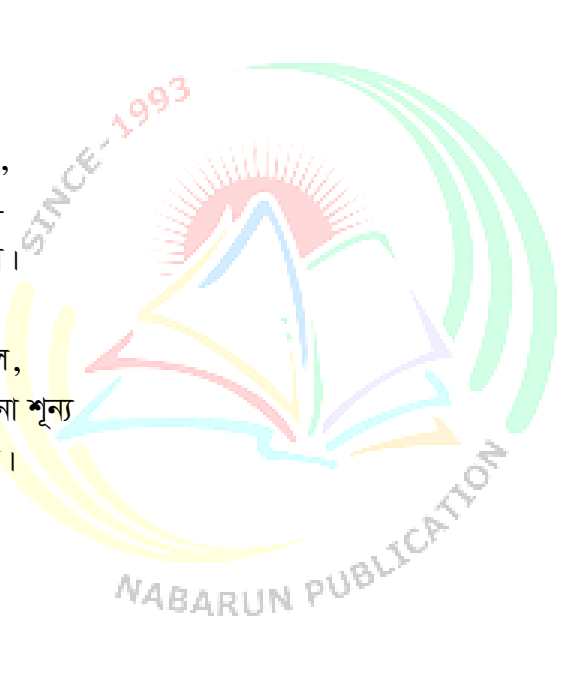
অবিশ্রান্ত; একে একে হয় জড়ো,

এ বয়স কালো লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে

এ বয়স কাঁপে বেদনায় থরোথরো।

তবু আঠারোর শুনেছি জয়ধ্বনি,

এ বয়স বাঁচে দুর্যোগে আর ঝড়ে,



বিপদের মুখে এ বয়স অগ্রণী
এ বয়স তবু নতুন কিছু তো করে।
এ বয়স জেনো ভীৰু, কাপুরুষ নয়
পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে,
এ বয়সে তাই নেই কোনো সংশয়—
দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।।

সারসংক্ষেপ

সুকান্ত ভট্টাচার্য ‘আঠারো বছর বয়স’ কবিতায় তারুণ্যের দুর্বীর শক্তি, সাহস, স্পর্ধা ও আত্মত্যাগের মানসিকতাকে তুলে ধরেছেন। আঠারো বছরের তরুণ বাধা-বিপত্তিকে ভয় না করে মাথা উঁচু করে এগিয়ে যেতে চায় এবং প্রয়োজনে দেশের জন্য আত্মত্যাগ করতেও প্রস্তুত থাকে। এই বয়সে যেমন দুঃসাহস, প্রাণশক্তি ও নতুন কিছু করার আকাঙ্ক্ষা প্রবল, তেমনি সংগ্রাম ও বিপদের আঘাতও আসে বারবার। তবু তরুণেরা বিপদের মুখে পিছিয়ে যায় না; তারা দুর্যোগের মধ্যেও জয়ের স্বপ্ন দেখে এবং নতুন সমাজ ও নতুন ভবিষ্যৎ নির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। তাই কবি দেশের বুকে সাহসী ও কর্মপ্রাণ আঠারো বছরের তারুণ্যের আবির্ভাব কামনা করেছেন।

১১. আমি কিংবদন্তির কথা বলছি – আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

আমি কিংবদন্তির কথা বলছি

আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।

তাঁর করতলে পলিমাটির সৌরভ ছিল

তাঁর পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল

তিনি অতিক্রান্ত পাহাড়ের কথা বলতেন

অরণ্য এবং স্থাপদের কথা বলতেন

পতিত জমি আবাদের কথা বলতেন

তিনি কবি এবং কবিতার কথা বলতেন।

জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি সত্য শব্দ কবিতা

কর্ষিত জমির প্রতিটি শস্যদানা কবিতা।

যে কবিতা শুনতে জানে না

সে ঝড়ের আর্তনাদ শুনবে।

যে কবিতা শুনতে জানে না

সে দিগন্তের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে।

যে কবিতা শুনতে জানে না

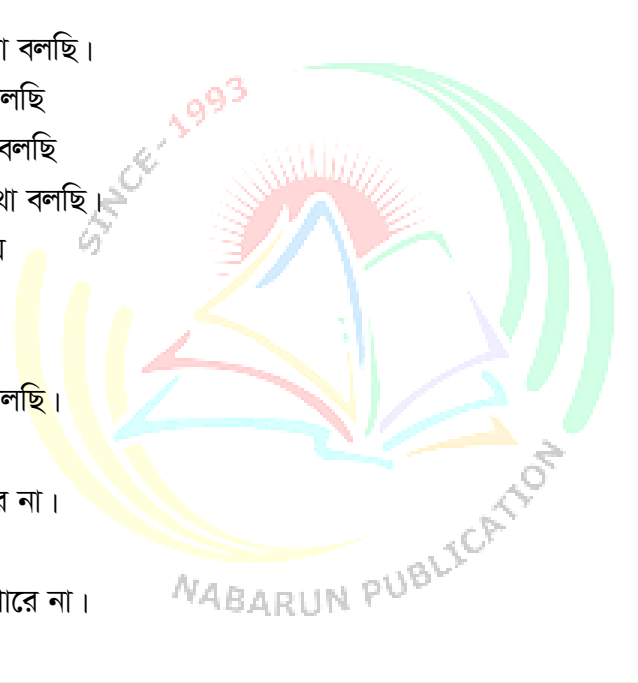
সে আজন্ম ক্রীতদাস থেকে যাবে।

আমি উচ্চারিত সত্যের মতো

স্বপ্নের কথা বলছি।

উনোনের আগুনে আলোকিত

একটি উজ্জ্বল জানালার কথা বলছি ।
আমি আমার মায়ের কথা বলছি,
তিনি বলতেন প্রবহমান নদী
যে সাঁতার জানে না তাকেও ভাসিয়ে রাখে ।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে নদীতে ভাসতে পারে না ।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে মাছের সঙ্গে খেলা করতে পারে না ।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে মায়ের কোলে শুয়ে গল্প শুনতে পারে না ।
আমি কিংবদন্তির কথা বলছি
আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি ।
আমি বিচলিত স্নেহের কথা বলছি
গর্ভবতী বোনের মৃত্যুর কথা বলছি
আমি আমার ভালোবাসার কথা বলছি ।
ভালোবাসা দিলে মা মরে যায়
যুদ্ধ আসে ভালোবেসে
মায়ের ছেলেরা চলে যায়,
আমি আমার ভাইয়ের কথা বলছি ।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে সম্ভানের জন্য মরতে পারে না ।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে ভালোবেসে যুদ্ধে যেতে পারে না ।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে সূর্যকে হৃৎপিণ্ডে ধরে রাখতে পারে না ।
আমি কিংবদন্তির কথা বলছি
আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি ।
তাঁর পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল
কারণ তিনি ক্রীতদাস ছিলেন ।
যে কর্ষণ করে
শস্যের সম্ভার তাকে সমৃদ্ধ করবে ।
যে মৎস্য লালন করে
প্রবহমান নদী তাকে পুরস্কৃত করবে ।
যে গাভীর পরিচর্যা করে



জননীর আশীর্বাদ তাকে দীর্ঘায়ু করবে।

যে লৌহখণ্ডকে প্রজ্বলিত করে

ইস্পাতের তরবারি তাকে সশস্ত্র করবে।

দীর্ঘদেহ পুত্রগণ

আমি তোমাদের বলছি।

আমি আমার মায়ের কথা বলছি

বোনের মৃত্যুর কথা বলছি

যুদ্ধের কথা বলছি

আমি আমার ভালোবাসার কথা বলছি।

আমি কবি এবং কবিতার কথা বলছি।

সশস্ত্র সুন্দরের অনিবার্য অভ্যুত্থান কবিতা

সুপুরুষ ভালোবাসার সুকণ্ঠ সংগীত কবিতা

জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি মুক্ত শব্দ কবিতা

রক্তজবার মতো প্রতিরোধের উচ্চারণ কবিতা।

আমরা কি তাঁর মতো কবিতার কথা বলতে পারবো

আমরা কি তাঁর মতো স্বাধীনতার কথা বলতে পারবো।

সারসংক্ষেপ

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতায় পূর্বপুরুষের সংগ্রাম, কৃষিজীবন, শোষণ, ভালোবাসা ও আত্মত্যাগের ঐতিহ্য তুলে ধরেছেন। পূর্বপুরুষের রক্তাক্ত জীবন ও মায়ের স্নেহের স্মৃতির মধ্য দিয়ে কবি সত্য, শ্রম, ভালোবাসা ও মুক্তির শক্তিকে কবিতার সঙ্গে একাত্ম করেছেন। কবির কাছে সত্য উচ্চারণ, শস্য উৎপাদন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং ভালোবেসে যুদ্ধে যাওয়াও কবিতা। শেষ পর্যন্ত তিনি নতুন প্রজন্মকে পূর্বপুরুষের মতো সত্য ও স্বাধীনতার কথা বলার এবং সংগ্রামী চেতনা ধারণ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

১২. প্রত্যাবর্তনের লজ্জা – আল মাহমুদ

শেষ ট্রেন ধরবো বলে এক রকম ছুটে ছুটে স্টেশনে পৌঁছে দেখি

নীলবর্ণ আলোর সংকেত। হতাশার মতোন হঠাৎ

দারুণ হুইসেল দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে।

যাদের সাথে শহরে যাবার কথা ছিল তাদের উৎকণ্ঠিত মুখ

জানালায় উবুড় হয়ে আমাকে দেখছে। হাত নেড়ে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

আসার সময় আঝা তাড়া দিয়েছিলেন, গোছাতে গোছাতেই

তোর সময় বয়ে যাবে, তুই আবার গাড়ি পাবি।

আম্মা বলছিলেন, আজ রাত না হয় বই নিয়েই বসে থাক

কত রাত তো অমনি থাকিস।

আমার ঘুম পেলো। এক নিঃস্বপ্ন নিদ্রায় আমি

নিহত হয়ে থাকলাম।

অথচ জাহানারা কোনদিন ট্রেন ফেল করে না। ফরহাদ

আধ ঘণ্টা আগেই স্টেশনে পৌঁছে যায়। লাইলী

মালপত্র তুলে দিয়ে আগেই চাকরকে টিকিট কিনতে পাঠায়। নাহার

কোথাও যাওয়ার কথা থাকলে আনন্দে ভাত পর্যন্ত খেতে পারে না।

আর আমি এঁদের ভাই

সাত মাইল হেঁটে শেষ রাতের গাড়ি হারিয়ে

এক অখ্যাত স্টেশনে কুয়াশায় কাঁপছি।

কুয়াশার শাদা পর্দা দোলাতে দোলাতে আবার আমি ঘরে ফিরবো।

শিশিরে আমার পাজামা ভিজে যাবে। চোখের পাতায়

শীতের বিন্দু জমতে জমতে নির্লজ্জের মতোন হঠাৎ

লাল সূর্য উঠে আসবে। পরাজিতের মতো আমার মুখের উপর রোদ

নামলে, সামনে দেখবো পরিচিত নদী। ছড়ানোছিটানো

ঘরবাড়ি, গ্রাম। জলার দিকে বকের ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে। তারপর

দারুণ ভয়ের মতো ভেসে উঠবে আমাদের আটচালা।

কলার ছোট বাগান।

দীর্ঘ পাতাগুলো না না করে কাঁপছে। বৈঠকখানা থেকে আঝা

একবার আমাকে দেখে নিয়ে মুখ নিচু করে পড়তে থাকবেন,

ফাবি আইয়ে আলা ই-রাব্বিকুমা তুকাজিবান ...।

বাসি বাসন হাতে আমরা আমাকে দেখে হেসেফেলবেন।

ভালোই হলো তোর ফিরে আসা। তুই না থাকলে

ঘরবাড়ি একেবারে কেমন শূন্য হয়ে যায়। হাত মুখ

ধুয়ে আয়। নাস্তা পাঠাই।

আর আমি মাকে জড়িয়ে ধরে আমার প্রত্যাবর্তনের লজ্জাকে

তুলে ফেলবো ঘষে ঘষে।

সারসংক্ষেপ

আল মাহমুদের ‘প্রত্যাবর্তনের লজ্জা’ কবিতায় কবি শেষ ট্রেনটি ধরতে না পেরে হতাশ ও লজ্জিত হয়ে পড়েন।

অন্যরা সময়মতো ট্রেনে উঠলেও তিনি নিজের অসতর্কতার কারণে কুয়াশাচ্ছন্ন রাতে অখ্যাত স্টেশনে একা পড়ে

যান। ফিরে আসার পথে তাঁর মনে ভেসে ওঠে পরিচিত গ্রাম, বাড়ি, আঝা ও আমাদের স্নেহময় মুখ। ----- শেষ

পর্যন্ত মায়ের ভালোবাসায় তিনি নিজের ব্যর্থতা ও প্রত্যাবর্তনের লজ্জা ভুলে আপন ঘরে ফিরে আসার শান্তি অনুভব করেন।